গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

BIGYAN ANNESWAK

ISSN 2582-5674

বর্ষ - ১৮ | সংখ্যা- ১ | জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২১ | RNI : WBBEN/2003/11192 | মূল্য : ১৫ টাকা

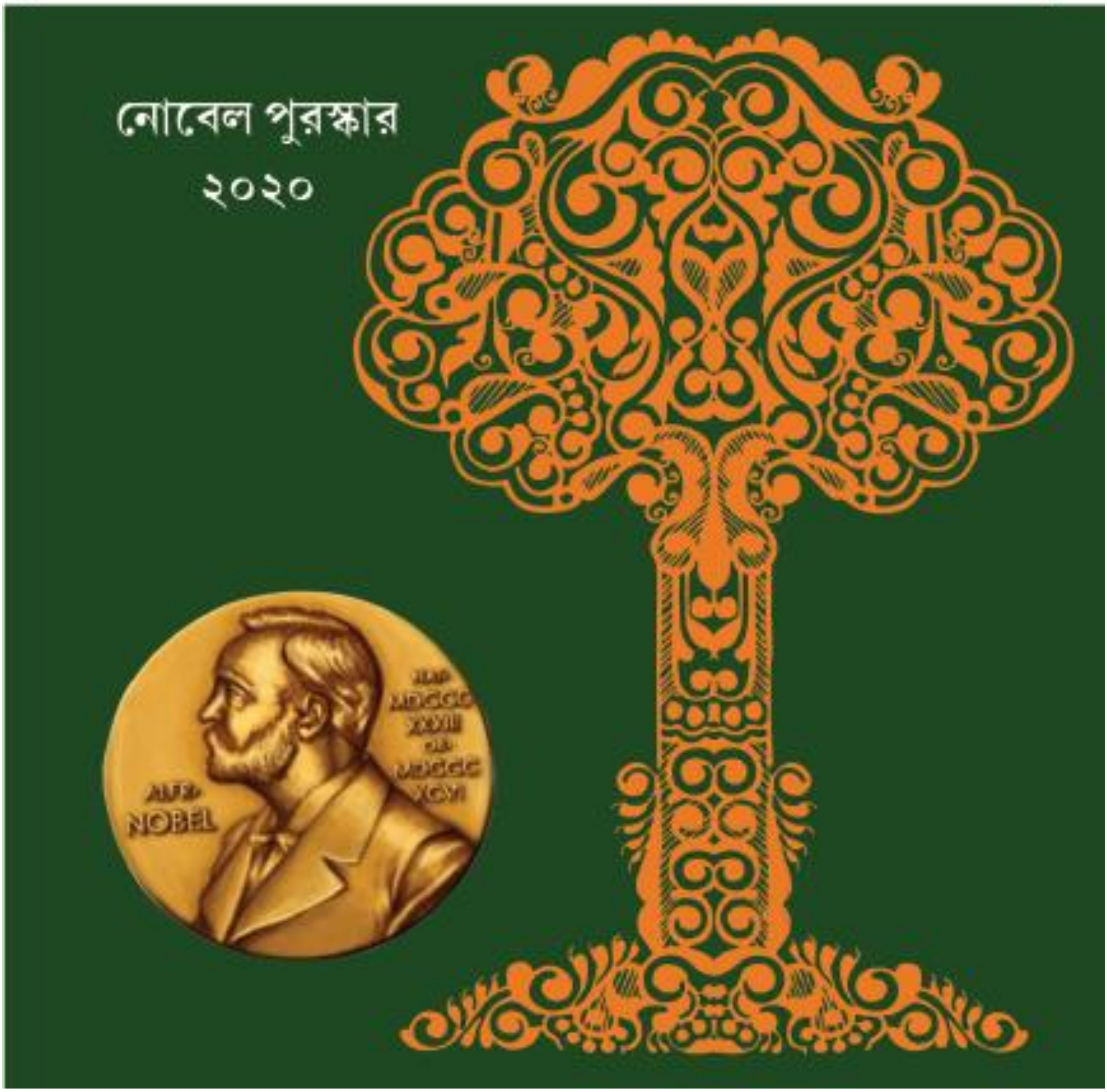

সূচি

১ আমাদের কথা

২ হেপাটাইটিস C আবিষ্কারের নেপথ্যে — জগন্ময় মজুমদার

৪ বিজ্ঞানী দরজীর কাঁচি — তপন দাস

৬ পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার — রতন দেবনাথ

৭ নোবেল শান্তি পুরস্কার — ডাঃ শঙ্কর কুমার নাথ

৮ আপেক্ষিক তত্ত্ব : একটি সহজ পাঠ — অনিন্দ্য দে

১২ পরম মানের গল্প — মনতোষ মিত্র

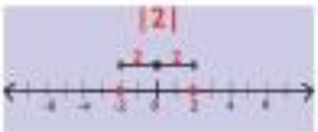

১৬ ডাইনি — গার্গী নাথ মজুমদার

১৮ প্রাকৃতিক সহবস্থান — অমর কুমার নায়ক

২১ বৈদুর্য্য নীহারিকা — তন্ময় ধর

২১ জানো কি? — কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

২২ কবিতা — জগন্ময় মজুমদার / অমর ঘোষ / শিবপ্রসাদ পাল / নির্মাল্য দাশগুপ্ত / চন্দ্রশেখর ঘোষ / রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক

২৪ জ্যোতিষের শূন্যগর্ভতা — গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি — নরেন্দ্র দাভোলকর

৩০ জনভাবনায় গণটিকা — সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

৩১ নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সন্ধান — অমিতাভ চক্রবর্তী

৩২ বার্ধক্য প্রতিরোধক প্রচেষ্টা — প্রবীর বসু

৩ য় প্রচ্ছদ — যারা হারিয়ে যাচ্ছে — রাজা রাউত

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

তাপস মজুমদার

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সর্দার, জগন্ময় মজুমদার, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, প্রবীর বসু, সৌরভ মুখার্জী

: website :
www.ssu2011.com/bigyan-anneswak

: e-mail :
1.bigyanannesak1993@gmail.com.

: Whatsapp No. :
9874778216, 9143264159

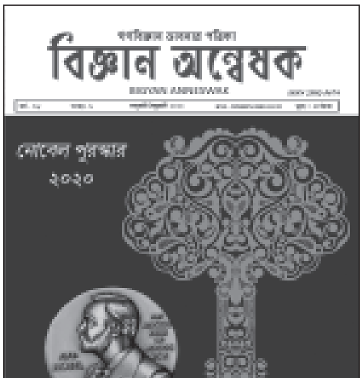

প্রচ্ছদ বিন্যাস অঙ্গসজ্জা

তাপস মজুমদার

অঙ্কন

সৌরভ মুখার্জী   বিজন কুণ্ডু

সুভাষিতম্

'স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে; স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা, মানুষকে ঘুমোতে দেয় না।'

—এপিজে আবদুল কালাম

আমাদের কথা

নোবেল ?

এই যেমন, ঝমঝম করে উৎসব চলছে। নরনারী মেতে আছে উৎসবের কোন না কোন অনুষঙ্গে। এরই মধ্যে আমরা হয়ত খেয়াল করি না, কয়েকজন থেকে যায় উৎসব বৃত্তের বাইরে। সেই কয়েকজনের, যাদের উৎসবে অংশগ্রহণের ন্যূনতম অর্থসংস্থান নেই, তাদের হতাশা, তাদের শূন্যদৃষ্টি উৎসব বৃত্তের বাইরেই পাক খায়।

এই যেমন, প্রতি বছর সুইডিশ নোবেল কমিটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের পুরস্কারটি ঘোষণা করেন। সকল উন্নত দেশের বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ তাঁদের দেশের কোন বিজ্ঞানীর নাম শোনার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতিক্ষায় থাকেন। আশ্চর্যের, এখানে ভারতের স্থান থাকে না। যেন, তাঁদের পুরস্কারের প্রত্যাশা অপরাধ বিশেষ। যেন, নিঃশব্দ চিৎকারে বলা হচ্ছে, আমাদের এই শ্রেষ্ঠ অঙ্গণে তোমার কাজ কি?

সেই ৯০ বছর আগে, ১৯৩০ সালে রমন ইফেক্টের জন্য সি ভি রমন নোবেল পুরস্কার পেলেন। সেই প্রথম, সেই শেষ (?) যদিও এরপর সত্যেন বসু, জগদীশ চন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা তাদের গবেষণাকে নোবেল পুরস্কারের যোগ্য করে তুলেছিলেন। লক্ষ্যণীয় এই উল্লেখিত বরেণ্য বিজ্ঞানীরা সকলেই স্বাধীনতার আগেই সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিবেশে তাদের কাজের পরিণতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর? স্বাধীন ভারতে কর্মরত পরিচিত নামটি কোথায়? চট করে যে নামগুলি মনে আসবে, যেমন হরগোবিন্দ খোরানা, সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখর, ভেঙ্কটরামন কৃষ্ণন এরা সকলেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু এদের জন্ম ও শিক্ষা ভারতে হলেও, কর্মক্ষেত্র ও গবেষণা সকলই স্বদেশের বাইরে। তাই আমরা তাদের সম্পূর্ণ ভারতীয় বিজ্ঞানী বলতে পারি না। তাই আমাদের হাতে শূন্য ছাড়া কিছুই থাকছে না।

এখানেই প্রশ্ন— কেন? কেন আমরা আত্মসমালোচনা করবো না? কিসের অভাব? পরিবেশ? পরিকাঠামো? অপ্রতুল শিক্ষা বাজেট? মৌলিক গবেষণার জন্য ক্রমক্ষীয়মান অর্থের সংস্থান? গবেষণায় আত্মত্যাগের অভাব? শিক্ষাক্ষেত্রে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতার অভাব? সরকারি পর্যায়ে উৎসাহদানে খামতি? কেন? কেন?

বরং প্রশ্নগুলোকে প্রতি বছর উদ্‌যাপন করা যাক।

—তাপস মজুমদার

ISSN 2582-5674

9 772582 567004

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যোগাযোগ : ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২/৯২৩১৫৪৫১৯১

জ গ ন্ম য় ম জু ম দা র

হেপাটাইটিস C আবিষ্কারের নেপথ্যে

এ বছর অর্থাৎ ২০২০-তে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনজন বিশ্রুত বিজ্ঞানী যৌথভাবে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। এ খবর এখন আর কারো অজানা নেই। তাঁরা হচ্ছেন হার্ভে জে অলটার, মাইকেল হটন এবং চার্লস এম রাইস। তাঁরা ভিন্ন দেশের নাগরিক হলেও তাঁদের অভিন্নতা মানব কল্যাণমুখী মননে ও কাজে। বিশেষত যখন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সাধারণ মানুষ লিভার ক্যান্সার এবং সিরোসিসের মত মারণব্যাধিতে আক্রান্ত এবং জর্জরিত। এ হেন রোগের জন্য যে রক্তবাহিত ভাইরাসটি অর্থাৎ হেপাটাইসিস C দায়ী যা একদিন বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল সেটিকে সঠিকভাবে শনাক্ত এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার কৌশল আবিষ্কারে সিদ্ধান্তমূলক বিশেষ ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ তাদের এই পুরস্কার। নিঃসন্দেহে বিশ্ববাসীর কাছে এ এক আনন্দ সন্দেশ।

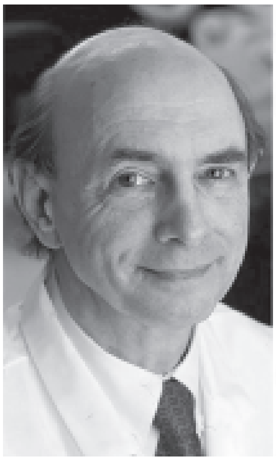

হার্ভে জে অলটার

মাইকেল হটন

চার্লস এম রাইস

হেপাটাইটিস—মানব জাতির স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে এক সন্ত্রাস বিশেষ। লিভার এবং লিভারের প্রদাহ—এই দুটি শব্দের মিলিত নির্যাস গ্রীক শব্দে হেপাটাইটিস নামে পরিচিত। মূলত ভাইরাস সংক্রমণজনিত হলেও অ্যালকোহল এবং পরিবেশের বিষাক্ত দূষণও এর জন্য কম দায়ী নয়। চারের দশকের শুরুতেই বিজ্ঞানী মহলে স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল যে হেপাটাইটিস হওয়ার পেছনে দুটি প্রধান সংক্রামক অর্থাৎ হেপাটাইটিস A এবং B ক্রিয়াশীল। হেপাটাইটিস A যদি দূষিত জল বা খাদ্যবাহিত হয়, মানব শরীরে তেমন দীর্ঘমেয়াদি কোনো প্রভাব ফেলে না, সেই তুলনায় হেপাটাইটিস B রক্ত এবং শরীরের রস বাহিত হয়ে অত্যন্ত মারাত্মক রূপ নেয় যা ক্রমশ ক্রণিক এমনকি লিভারের ক্ষত তথা সিরোসিস, পরিণতিতে অবশেষে ক্যান্সার পর্যন্ত সৃষ্টি করে।

একজন হেপাটাইটিস আক্রান্ত মানুষের কাছাকাছি থাকা মানুষও নিজের অজান্তে বহুদিন উপসর্গবিহীনভাবে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে নীরব ঘাতকের ভূমিকা পালন করে হেপাটাইটিস B। রক্তবাহিত হেপাটাইটিস B, সুতরাং মানুষের মৃত্যু বা নশ্বরতার অভিমুখে সতত এক পা বাড়ানো এমন এক সাংঘাতিক ভাইরাস যার সঙ্গে কেবল তুলনা চলে HIV এবং টিউবারকুলোসিসের সংক্রমণ।

সংক্রমণশীল রোগের জন্য দায়ী যে বিশেষ সংক্রামক, তাকে খুঁজে পাওয়াটাই তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার মূল হাতিয়ার। কেননা অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ছায়াযুদ্ধের-ই নামান্তর। ১৯৬০-এ বিজ্ঞানী বারুচ ব্লুশবার্গ রক্তবাহিত হেপাটাইটিস B আবিষ্কার এবং তার প্রতিষেধক ভ্যাক্সিনের যথার্থ পরীক্ষা ও সফল প্রয়োগের জন্য শারীরবিজ্ঞান বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়েই বিজ্ঞানী হার্ভে জে অলটার ইউ এস ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ-এ এক ট্রান্সফিউশান (মানবদেহের রক্ত প্রবাহের মধ্যে অন্তর্গত শিরার মাধ্যমে এক দেহ থেকে আরেক দেহে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি। এনিমিয়া, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা প্রভৃতিতে সাধারণত ব্যবহৃত হয়) এর মাধ্যমে রক্ত নেওয়া হেপাটাইটিস রোগীদের নিয়ে কাজ করছিলেন। এবং গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন যে কিছু রোগী আরোগ্যলাভ করলেও অধিকাংশ রয়ে যাচ্ছেন নিরাময়হীন। এর কোনো সদর্থক ব্যাখ্যা ছিল না তাঁর কাছে। কেননা ইতিমধ্যে হেপাটাইটিস A ও B-এর কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা হয়ে গেছে। কি এর কারণ? অন্তত হেপাটাইটিস A বা Bও নয়, তাহলে?

রক্ত ট্রান্সফিউশানের পর দেখা গেল অজস্র রোগী তখনও শরীরে ক্রণিক হেপাটাইটিসের উপসর্গ নিয়ে ঘুরছে অন্য কোনো অচেনা অজানা মারণ সংক্রামকের কারণে। বিজ্ঞানী অলটার এবং তাঁর সহ-গবেষকরা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখলেন রোগীর রক্ত যদি শিম্পাঞ্জির শরীরে প্রয়োগ করা হয় তাহলে শিম্পাঞ্জিও যথারীতি আক্রান্ত হচ্ছে। পরবর্তী পরীক্ষায় তাদের প্রতীতি হয় যে অজানা ওই সংক্রামকের বৈশিষ্ট্যগুলি একদম ভাইরাসের মত। শিম্পাঞ্জির রহস্যময় ওই অসুখের নাম দিলেন তাঁরা Non-A, Non-B হেপাটাইটিস।

নতুন এই রহস্যময় অসুখের নেপথ্যে যে ভাইরাস—কি এর আসল স্বরূপ তার সন্ধানে বিজ্ঞানীরা এরপর অতি তৎপর হয়ে উঠলেন স্বাভাবিক ভাবে। পুরো একটি দশক পেরিয়ে গেল—অছোঁয়া, অধরা থেকে গেল সেই ভাইরাস। কিন্তু আরেক বিজ্ঞানী মাইকেল হটন যিনি তখন একটি ফার্মাসিউটিক্যাল ফার্মে কর্মরত ছিলেন, উক্ত ভাইরাসের জেনেটিক পরম্পরাগুলি পৃথকীকরণের মত শ্রমসাধ্য জটিলতম কর্মকান্ডে এগিয়ে এলেন।

হটন এবং তাঁর সহ-বিজ্ঞানীরা তারপর আক্রান্ত সেই শিম্পাঞ্জির রক্ত থেকে প্রাপ্ত নিউক্লিক অ্যাসিড থেকে DNA-র একটি সঞ্চয় ভান্ডার তৈরি করলেন। বলাবাহুল্য এই DNA কণাগুলির অধিকাংশ ছিল শিম্পাঞ্জির জিনোম থেকে প্রাপ্ত। কিন্তু বিজ্ঞানীদের সন্দেহ হয়, অবশিষ্টগুলি হয়ত হতেও পারে সেই অজানা ভাইরাসের DNA-র

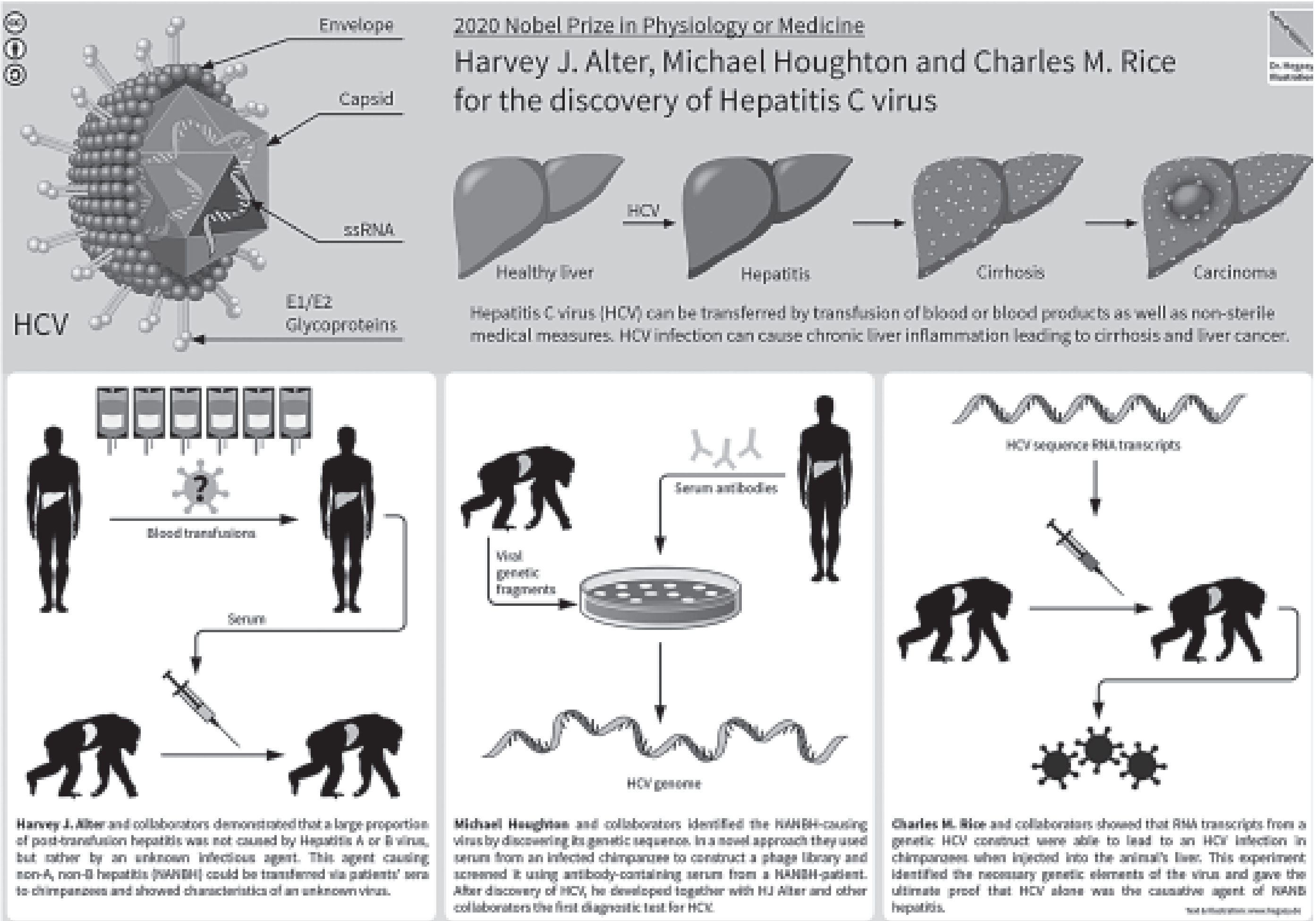

কণা। তাদের মনে হল হেপাটাইটিস আক্রান্ত রোগীর রক্তে থাকলেও থাকতে পারে উক্ত ভাইরাসের বিরুদ্ধে সৃষ্ট কোনো অ্যান্টিবডি। অতি সতর্কতার সঙ্গে তাই গবেষকরা এজন্য ভাইরাল প্রোটিনের কোড সম্পন্ন DNA-র ক্লোন (অবিকল প্রতিলিপি) শনাক্ত করতে রোগীর রক্তের সিরাম ব্যবহার করলেন। এভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অবশেষে তাঁরা সফলতার মুখ দেখলেন, পেলেন সেই বহু প্রত্যাশিত কাঙ্ক্ষিত ক্লোন। এবং আরো পরীক্ষার পর জানা গেল নতুনতর অন্য এক অজানা RNA সঞ্জাত ছিল ওই ক্লোন যেটি ফ্লাভি ভাইরাস গোত্রের অন্তর্গত। নাম দেওয়া গেল হেপাটাইটিস C ভাইরাস। ক্রণিক হেপাটাইটিস রোগীর শরীরে উপস্থিত উক্ত অ্যান্টিবডি হচ্ছে ভাইরাসের সেই হারানো এজেন্ট।

হেপাটাইটিস C তো পাওয়া গেল কিন্তু রয়ে গেল ছোট্টো এক অমিমাংসিত ধাঁধা। এই ভাইরাস কী একা একাই হেপাটাইটিস সংক্রমণে সক্ষম। এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক চার্লস এম বাইসের ভূমিকার কথা না বললে নয়। তিনি তখন তার অন্য সহ-গবেষকদের সঙ্গে RNA ভাইরাস নিয়ে কাজ করছিলেন। তিনি সন্দেহের চোখে লক্ষ করলেন হেপাটাইটিস C ভাইরাসের জিনোমের শেষ অংশে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যহীন অঞ্চল আছে যা ভাইরাসের আত্মপ্রতিলিপি গঠনে সক্ষম হলেও হতে পারে। রাইসের পর্যবেক্ষণে আরো ধরা পড়ল যে পৃথক্‌কৃত ভাইরাস নমুনাগুলির কেউ কারুর মত নয়। প্রকরণগত ভাবে আলাদা এবং সেগুলি ভাইরাস প্রতিলিপিতে হয়ত বাধার সৃষ্টি করলেও করতে পারে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে রাইস এরপর কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করলেন হেপাটাইটিস C ভাইরাসের একটি RNA-র প্রকরণ যার মধ্যে আছে সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যহীন অঞ্চলটি যা জেনেটিক প্রকরণ সৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় থাকে। তাঁর এই গবেষণালব্ধ RNA যখন তিনি শিম্পাঞ্জির লিভারে প্রবেশ করালেন, দেখলেন শিম্পাঞ্জির রক্তেও ঘটে গেছে ভাইরাসের অনুপ্রবেশ, মানব শরীরে ক্রণিক হেপাটাইটিসে যে সমস্ত যন্ত্রণার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় সেগুলিও। এভাবেই ধাপে ধাপে যেন এ ওঁর পরিপূরক হয়ে যা একদিন শুরু করেছিলেন বিজ্ঞানী অলটার, মাঝে বিজ্ঞানী হটন হয়ে শেষ করলেন রাইস।

তাঁদের এই যুগান্তকারী আবিষ্কার ভাইরাস ঘটিত রোগের বিরুদ্ধে একটি মাইলফলক বিশেষ। বিশ্বের স্বাস্থ্য-মানচিত্রে হেপাটাইটিস C-এর আবিষ্কার অবশ্যই একটি লাল অক্ষর। বর্তমানে অত্যন্ত সংবেদনশীল রক্ত পরীক্ষার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। রক্ত ট্রান্সফিউশানের মত কষ্টকর পরীক্ষার ক্রমশ অবসান হচ্ছে। একমাত্র এটি সম্ভব হয়েছে উক্ত বিজ্ঞানী ত্রয়ীর জন্য। এই আবিষ্কার অ্যান্টি-ভাইরাল ড্রাগ তৈরিতেও সাহায্য করবে। হেপাটাইটিস C আবিষ্কার হয়েছে মাত্র, এর মূলোৎপাটন হয়নি তখনো। হয়ত অন্য কোনো বিজ্ঞানী এই দুরূহ কাজটি সমাধা করবে একদিন। সাগ্রহে অপেক্ষা করব আমরা।

M. 6289013063

তপন দাস

বিজ্ঞানী দরজীর কাঁচি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনে অনেক কঠিন এবং অসাধ্যকে সাধ্য করে তোলা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যদি বলা যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কি পারবে কোনো বংশগত রোগকে সারিয়ে তুলতে? অথবা যদি বলা যায় সুস্থ কোনো কোষকে আঘাত না করে, আক্রান্ত ক্যানসার কোষকে সারিতে তুলতে পারবে? আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলা যায় হ্যাঁ পারবে। যা, কিছু বছর আগেও ছিল রূপকথার গল্পের মত আজ বিজ্ঞানী তার পরীক্ষাগারে বাস্তব রূপ দিতে সম্ভব হয়েছে। যে দুজন বিজ্ঞানী অসাধ্যকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন তারা হলেন এবারের ১ কোটি সুইডিশ ক্রোনার বিজেতা অর্থাৎ এবারের রসায়নে নোবেলজয়ী দুই মহিলা ইমানুয়েল শাঁরপেতিয়ে এবং জেনিফার এ ডাওডনা।

জেনিফার এ ডাওডনা ইমানুয়েল শাঁরপেতিয়ে

সমাজের কিছু ধর্মভীরু মানুষ অনেক রোগকে বংশের অভিশাপ রূপে চিহ্নিত করে থাকেন। সেই পরিবার কোনো একটি রোগকে অভিশাপ মেনে নিয়েই নীরবে জীবন কাটান। ডাক্তারবাবুরা কিছু করতে পারছিলেন না। আজ সেই অভিশাপ থেকে সেই পরিবারকে মুক্ত করার দায়িত্ব নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। যেমন বংশগত অন্ধত্ব এবং সিক্‌লসেল অ্যানিমিয়া আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এবারের নোবেলজয়ীদের আবিষ্কৃত পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। হিমোফিলিয়া (রক্ত তঞ্চন বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষরণ বন্ধ হয় না) রোগটি ফ্যাক্টর ৮ এবং ফ্যাক্টর ৯ যার মূল কারণ। এবারের নোবেলজয়ীদের হাত ধরে আসতে পারে হিমোফিলিয়া থেকে মুক্তির উপায়। আবার সারা বিশ্বে থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাটাও কিন্তু একেবারে কম নয়। থ্যালাসিমিয়া একটি জিনের মিউটেশন জনিত কারণে হয়ে থাকে। জিন এডিটিং হয়ত এখানেও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে। আসলে কোনো সমস্যাকে সমাধানের জন্য মানুষ কিংবা রাষ্ট্র সব সময়ই টোকা দিয়েছে বিজ্ঞানীর দরজায়। বিজ্ঞানী মানুষের চাহিদা, সমাজের চাহিদা অথবা রাষ্ট্রের চাহিদার কথা চিন্তা করে নেমে পড়েছে নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের পথে। এই সময় যখন সারা বিশ্ব কোভিড-১৯ অতিমারীতে আক্রান্ত, তখনও মানুষ থেকে রাষ্ট্র তাকিয়ে আছে বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারের দিকে। বিজ্ঞানী লেগে পড়েছে তার স্বভূমিকা পালনে। ঠিক তেমনি রসায়নবিদ্‌রা লেগে পড়েছে অণুগুলিকে আরও কিভাবে নতুন ভাবে সুসজ্জিত করে তোলা যায়। এই সুসজ্জায় সাজাতে গিয়েই কখনো কখনো প্রয়োজন হয় উন্নত মানের কাঁচির। এখানে কাঁচি অর্থে বিশেষ পদ্ধতি।

জিন কাঁটা ছেঁড়ার সবচেয়ে ধারালো কাঁচি আবিষ্কার করেছেন ইমানুয়েল-জেনিফার। এই কাঁচির মাধ্যমে জীবাণুর জিন বস্তুও নিখুঁত ভাবে কাটাছেঁড়া করা যায়। জিনের বদল ঘটিয়ে জিনে লেখা সংকেতগুলিকে পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছেন জন্মসূত্রে ফ্রান্সের ইমানুয়েল। ফ্যারিনজাইটিস, টনসিলাইটিস, স্কারলেট ফিভার, রিউম্যাটিক ফিভারের মত মানুষের অনেক রোগের কারণ, স্ট্রেপ্টোকক্কাস জেনাস যথা পায়োজেনস্ নামে একটি ব্যাকটেরিয়া, যা নিয়ে কাজ করতে করতে ইমানুয়েল সন্ধান পান অজানা অণুর (ট্রেসার-আরএনএ)। তিনি দেখিয়েছেন এই অণু ব্যাকটেরিয়াটি আত্মরক্ষার জন্য ক্রিসপার পদ্ধতির (ক্লাস্টার্ড রেগুলারলি ইনটার স্পেসড শর্ট প্যালিনড্রোমিক রিপিডস্) মাধ্যমে ভাইরাসের দেহ থেকে তার ডিএনএ-কে ছিন্ন করে। ভাইরাল ডিএনএ সমেত ব্যাকটেরিয়ার ক্রিসপার সিকোয়েন্সটি একটি লম্বা ক্রিসপার আরএনএ তৈরি করে। সংলগ্ন ক্যাসজিন থেকে তৈরি হয় ক্যাস৯ প্রোটিন। ট্রেসার আরএনএ'র সাথে যুক্ত হয়ে যায় ক্রিসপার আরএনএ। ট্রেসার আরএনএ ও ক্যাস৯ দুজনে রাইবোনিউক্লিয়েজ-৩ প্রোটিনের সাহায্যে আরএনএ'র একটা ছোট অংশ কেটে নিয়ে নিজেদের দলে টেনে নেয়। যা আসলে তৈরি হয়েছিল প্রথম ধাপে ভাইরাসের ডিএনএ থেকে। দ্বিতীয়বার ভাইরাস আক্রমণ করলে ট্রেসার আরএনএ তা সহজেই চিহ্নিত করতে পারে। এখানে সে এক ধরনের গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করে। এই গুপ্তচরের থেকে খবর পেয়েই ভাইরাল ডিএনএ, সিকোয়েন্স-এর কোথায় আক্রমণ করতে হবে তা চিহ্নিত হয়। নির্দিষ্ট সিকোয়েন্স চিহ্নিত হওয়ার পরেই ক্যাস৯ সেটিকে কেটে ফেলে এবং সেই সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই পদ্ধতির অস্তিত্ব প্রমাণে ইমানুয়েলের সাথে ছিলেন জন্মসূত্রে আমেরিকান জেনিফার।

গ্রিক শব্দ জিনের অর্থ শিকড়। একটি বিস্তৃত ডিএনএ অণুর নির্দিষ্ট খন্ডাংশ, যা জীবের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে বা বলা চলে বংশগতির

ধারক ও বাহককে জিন বলে। সব কোষেই বংশগতির পদার্থগুলো বহনের জন্য ডিএনএ থাকে। কোষের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিউক্লিয়াস। এখানেই থাকে ক্রোমোজোম নামের রাসায়নিক তন্তু। ডিএনএ-এর একমাত্র স্থায়ী রাসায়নিক উপাদান। এটিই বংশগতির ধারক ও বাহক।

ঊনবিংশ শতাব্দিতে ধর্মযাজক গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের গবেষণায় জিন বিজ্ঞানের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। জীবের বাহ্যিক গঠন ও আচরণ নির্ধারণে জিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু জিন ও জীব সত্ত্বার অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তার বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়। জিনোম হল জিনের জেনেটিক বৈশিষ্টের বিন্যাস বা নকশা। এর উপর নির্ভর করে ওই প্রাণী বা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। জীবদেহে অসংখ্য কোষের প্রতিটিই সেই জীবের বিকাশ ও গঠনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বহন করে। এসব নির্দেশনার সমন্বয়ই হল জিনোম।

জীবনের অনেক কাজকর্ম আছে, যেগুলি বুঝতে গেলে জিনের বদল ঘটানোও প্রয়োজন হয়। আর এই বদল ঘটানোর জন্য এমানুয়েল-জেনিফার কাঁচি এক অনবদ্য আবিষ্কার। পৃথিবীর দুই প্রান্তে

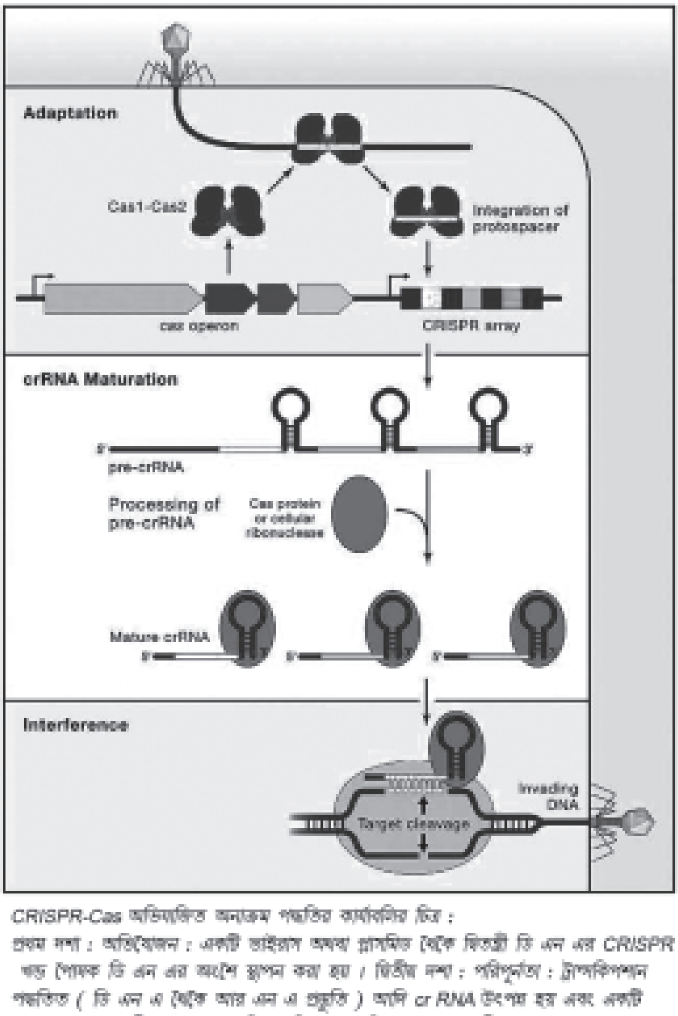

CRISPR-Cas অভিযোজিত অনাক্রম্য পদ্ধতির কার্যাবলির চিত্র :
প্রথম দশা : অভিযোজন : একটি ভাইরাস অথবা প্লাসমিড থেকে বিদেশী ডি এন এর CRISPR খন্ড পোষক ডি এন এর অংশে স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় দশা : পরিপূর্ণতা : ট্রান্সক্রিপশন পদ্ধতিতে (ডি এন এ থেকে আর এন এ প্রস্তুতি) আদি cr RNA উৎপন্ন হয় এবং একটি ক্ষুদ্র cr RNA তৈরী হয়। প্রত্যেকটি একটি জায়গা নিয়ে থাকে। তৃতীয় দশা : হস্তক্ষেপ : যখন cr RNA চেনা যায়, তখন এটা আগত ডি এন এ অংশে বিশেষত ক্ষতির যোজক অংশে কাটা হয়।

বসবাসকারী এই দুই বিজ্ঞানীর প্রথম আলাপ ২০১১ সালে। পুয়োর্ত রিকোতে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে। এমানুয়েলের জন্ম ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সে। বর্তমান কর্মস্থল জার্মানিতে, বার্লিনের ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইউনিট ফর দ্য সায়েন্স অব প্যাথোজেন্স-এ। জেনিফারের জন্ম ১৯৬৪ সালে আমেরিকায়। বর্তমানে তার কর্মস্থল বার্কলের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া। বায়োকেমিস্ট জেনিফারের আরএনএ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা আছে। অন্যদিকে ইমানুয়েল দীর্ঘদিন কাজ করেছেন দই থেকে প্রাপ্ত ব্যাকটেরিয়া স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিয়ে। তাদের একসাথে চলার পর থেকেই জিনোম এডিটিং-এর যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। তাদের এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রয়োজন মত ডিএনএ কেটে ফেলা ও ইচ্ছেমত অন্য ডিএনএ জুড়ে দেওয়ার গবেষণা শুরু হল বিশ্বজুড়ে। ক্রিসপারকে নানা কঠিন রোগের চাবিকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে বলে বিজ্ঞানীমহল মনে করেছেন। এই আবিষ্কারকে একটা বিস্ফোরণই বলা যেতে পারে। এই পদ্ধতি যে শুধুমাত্র কোনও রোগের চিকিৎসাতেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। গাছ-গাছালি নিয়ে গবেষণা, খরা বন্যা, কীটের আক্রমণ সইতে পারে এমন শস্য তৈরির ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার করা হচ্ছে। নোবেল জেতার খবর পেয়ে সংবাদ মাধ্যমে ইমানুয়েলের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, 'এটা যখন ঘটে, খুবই অবাক হয়ে যেতে হয়। মনে হয়, এটা বুঝি সত্য নয় কিন্তু এটা সত্যি।'

একটি প্রচলিত কথা আছে ক্যানসার সারে যদি তা গোঁড়াতেই ধরা পরে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ক্যানসারের কারণ তামাক, গুটকা জাতীয় পদার্থের সেবন, অ্যালকোহল পান ইত্যাদি। এর বাইরেও ক্যানসারের কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে বংশগত ধারা। তাই বলা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যানসার নিরাময় হয়ত সম্ভব হবে এই পদ্ধতির মাধ্যমে। তবে গবেষণার অন্ত নেই। বিভিন্ন রোগ একটি মানুষের কোন স্টেজে সনাক্ত হলে তা নিরাময় সম্ভব তা এখনো গবেষণার বিষয়। আমরা জানি একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই অ্যামিনোসি ড্রপলার টেস্ট ও অ্যামিনোসেনটেসিস্ (মনে রাখতে হবে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ একটি আইনত দন্ডনীয় অপরাধ) এর মাধ্যমে তার শারীরিক গঠনের কোনো ত্রুটি নির্ণয় করা সম্ভব। ক্যারিওটাইপ টেস্ট-এর সাথে আরও কিছু টেস্ট, শিশুর এমব্রায়োস্টেজে করে বা জাইগোট ইনটারফ্যালোপিয়ান প্রতিস্থাপনের আগে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো ত্রুটি সনাক্ত করা সম্ভব হয়, তাহলে হয়ত তার নিরাময়ও সম্ভব হবে এই জিনের কাঁচির মাধ্যমে। সব আবিষ্কারেরই একটা সীমারেখা থাকে। এক্ষেত্রেও হয়ত থাকবে কিন্তু আমরা আশার আলোর অপেক্ষায়। অর্থের দিক থেকে বিবেচনা করে সাধারণ মানুষের জন্য কতটা উপযোগী হয়ে ওঠে সেটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নোবেল জয়ীদের কাজের সার্থকতা আরও বৃদ্ধি পাবে যদি অসাধু ব্যবসায়ীদের কবল থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মুক্ত রাখা যায়। অন্যদিকে রসায়নে নোবেল জয়ী ইমানুয়েল-জেনিফার সহ সাত নারী আবারও প্রমাণ করল বিজ্ঞান গবেষণায় পিছিয়ে নেই মেয়েরাও।

email:tdcob25@gmail.com • M. 8944996755

রতন দেবনাথ

পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ২০২০

২০২০ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নেবেল পুরস্কার পেলেন তিন বিজ্ঞানী। রজার পেনরোজ, রাইনহার্ড গেঞ্জেল এবং আন্দ্রিয়া ঘেজ। পুরস্কারের অর্ধেক দেওয়া হয়েছে রজার পেনরোজকে এবং বাকি অর্ধেক সমান ভাগ করে দেওয়া হয়েছে গেঞ্জেল এবং ঘেজ এই দুজনের মধ্যে।

রাইনহার্ড গেঞ্জেল

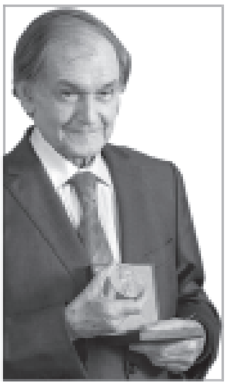
রজার পেনরোজ

আন্দ্রিয়া ঘেজ

ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর-এর বাস্তব অস্তিত্ব আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বেরই অনুসারী—যুগান্তকারী এই প্রতিপাদনের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রজার পেনরোজকে দেওয়া হয়েছে এই পুরস্কার আর আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রবিন্দুতে এক অতিকায় ঠাসা বস্তু আবিষ্কার করে যৌথভাবে পুরস্কার পেয়েছেন বার্কলের ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গেঞ্জেল এবং লস এঞ্জেলসের ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ঘেজ।

আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জটিল গণিতের চড়াই-উৎরাই পেড়িয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তা নিজে কোনদিন বিশ্বাসই করতে চাননি। তাত্ত্বিক গণিতের ফলাফল তাঁকে করে তুলেছিল অতিশয় বিস্ময়ান্বিত। তাঁর নিজের সৃষ্টিকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি। কি সেই সিদ্ধান্ত? তাঁর গাণিতিক বিশ্লেষণের ফল বলছিল এই মহাবিশ্বে ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর থাকা সম্ভব। বিশাল বিশাল আকৃতির সেই দৈত্য যা গোগ্রাসে গিলে খায় সব কিছু তার অস্তিত্ব কি আদৌ আছে? নাহ্, এ দৈত্য রূপকথার সেই বড় বড় দাঁত-নখওয়ালা কিম্ভূত-কিমাকার দৈত্য নয়। কৃষ্ণগহ্বর হল মহাজাগতিক এক বস্তু। অতিশয় বিশাল ভরসম্পন্ন এসব বস্তু টেনে নেয় সব কিছুই যা তার কাছে আসে। যেন এক সুবিশাল গর্ত বা গহ্বর। এমনকি আলোরও নিস্তার নেই তার খপ্পর থেকে। শুষে নেয় আলোকেও। যে জিনিস সব আলো শুষে নেয় তার রঙ কৃষ্ণ বা কালো। তাই এই মহাজাগতিক বস্তুটিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণগহ্বর নামে।

১৯৯০-এর শুরুতে গেঞ্জেল এবং ঘেজ প্রত্যেকে একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সাহচর্যে লক্ষ করছিলেন আমাদের ছায়াপথ মিল্কিওয়ের কেন্দ্রগত এক অঞ্চল। তার নাম স্যাজিটেরিয়াস-এ। প্রতিটি দলই সূক্ষ্ম নজর রাখছিলেন এই অঞ্চলের কাছাকাছি থাকা উজ্জ্বল কতিপয় নক্ষত্রের কক্ষপথের দিকে। আশ্চর্যের সঙ্গে দুটি দলই লক্ষ করলেন নক্ষত্রগুলোর কক্ষীয় বেগের মধ্যে এক অস্থিরতার ইঙ্গিত। যেন পাশ থেকে কেউ ওদের টানছে। ফলে তাদের গতিবেগে যেন এক চঞ্চলতার প্রকাশ ফুটে উঠেছে। ব্যাপারটা কি? সন্দেহ জাগে গেঞ্জেল এবং ঘেজ দুজনেরই মনে। এরকমটি তো হওয়ার কথা নয়। তাহলে তো আরও খুঁটিয়ে দেখতে হয়। ব্যবস্থাও হল। সাহায্য নেওয়া হল বিশ্বের সবচেয়ে বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের। উন্নত করা হল পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিরও। কেননা সুদূর পৃথিবীতে বসে আন্তর্নক্ষত্র অঞ্চলের গ্যাসীয় আবরণ ধুলোবালিকণা ভেদ করে যে পর্যবেক্ষণ তাতে সামান্যতম খাদও আশানুরূপ ফল থেকে বঞ্চিত করবে। শুধু তাই নয়। বাধা তো রয়েছে আরও। তার মধ্যে অন্যতম হল পৃথিবীর বায়ুমন্ডল। পৃথিবীর বায়ুমন্ডল যাতে পর্যবেক্ষণের অন্তরায় হয়ে বিকৃত ফল না দেয় তারও ব্যবস্থা নেওয়া হল। প্রযুক্তির সীমা ছাড়িয়ে উদ্ভাবন করা হল অদ্বিতীয় যন্ত্রাদির। চোখ রাখা হল ছায়াপথের কেন্দ্রবিন্দুতে। শুরু হল নিরন্তর পর্যবেক্ষণ। আর নিরন্তর এই পর্যবেক্ষণের সুবাদে দূর হল ধোঁয়াশা। স্যাজিটেরিয়াস-এ

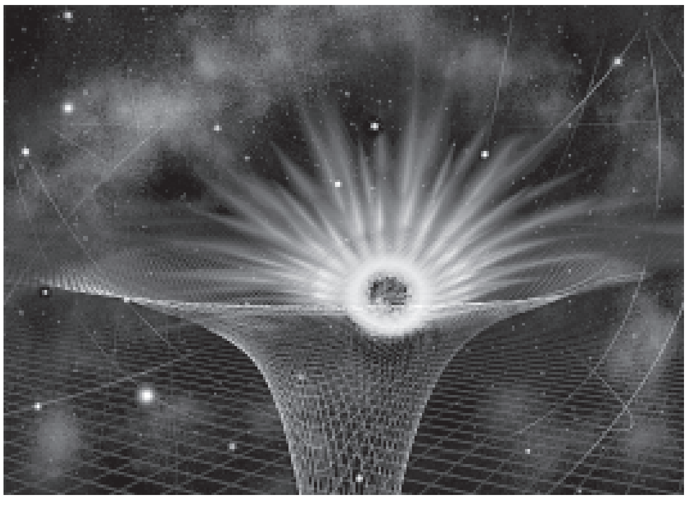

এর কাছাকাছি এলাকার নক্ষত্রগুলোর সেই পাগলপারা বেগের রহস্য উন্মোচিত হল। এক অতি অতিভারী অদৃশ্য মহাজাগতিক বস্তুর টানেই যে নক্ষত্রগুলোর সেই বেগতিক অবস্থা তার প্রমাণ মিলল। আর এই অতি অতিভারী মহাজাগতিক অস্তিত্বটিই হল এক বাস্তব ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর। তত্ত্ব এবং তার অনুসারী বাস্তব—এই দুইয়ের মিলনেই উজ্জ্বল এবারের পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার।

email:rdebnath1961@gmail.com • M. 9477934928

ডাঃ শঙ্কর কুমার নাথ

২০২০ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেল World Food Programme

২০২০ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাচ্ছে একটি বৃহৎ সমাজসেবামূলক সংগঠন—World Food Programme (WFP)। বিশ্বের কোণে কোণে প্রতিটি অভুক্ত মানুষকে খাদ্য পৌঁছে দেবার জন্য এই সংস্থা প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে সেই ১৯৬১ সাল থেকে। নোবেল শান্তি পুরস্কার দেবার জন্য নোবেল কমিটি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন, কোন সন্দেহ নেই।

এই সংস্থাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেবার কারণ—এঁরা যারা বিশ্বের যেখানেই মানুষ অনাহারে থাকে, সেটা ক্রনিক হতে পারে অর্থাৎ বছরের পর বছর অনাহার অর্ধাহার চলতে থাকা পৃথিবীর এমন সব দেশ, যেখানে খাদ্যের সন্ধানে মানুষকে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়, আবার খাদ্যের অভাবটা অ্যাকুট হতে পারে অর্থাৎ হঠাৎই কোন অঞ্চল বা দেশে খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে, যেমন যুদ্ধের সময়, বন্যা, মহাঝড়, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সময়, তখন এইসব জায়গাতেই WFP পৌঁছে যায় অনতিবিলম্বে। মানুষ এইরকম পরিস্থিতিতে সবকিছু হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে; তখন যুদ্ধের কারণে যত না মানুষ মারা যায়, খাদ্যের অভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে যায়। তখন কোথায় সুষম খাদ্য, কোথায় পুষ্টিকর খাদ্য, কোথায় রোগ প্রতিরোধক খাদ্য আর কোথায় বা দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে দাঁড়াবার মত শক্তি যোগানোর খাদ্য। মানুষ সেইরকম অবস্থায় অখাদ্য-কুখাদ্য খেতেও দ্বিধা করে না, যা মানুষকে আরও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। বিখ্যাত পর্তুগীজ পর্যটক ফার্দিন্যান্দ ম্যাজেলান (১৪৮০-১৫২১) সমুদ্রে পাঁচটি জাহাজে বহু লোকজনকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। একসময় খাদ্যের ভান্ডারে টান পড়ে, খাবারের অভাবে তাঁর বহু সহকর্মী নাবিকের মৃত্যু ঘটে যায়। ইতিহাস বলছে ঐ নিদারুণ খাদ্যসংকটে কেউ কেউ জামা-প্যান্টে লাগানো চামড়ার তৈরি বেল্ট কামড়ে কামড়ে খাবার চেষ্টা করেছিলেন। ক্ষুধার জ্বালা কি, তা এই একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।

এই সুন্দর পৃথিবীতে প্রকৃতি তার নিজের মত করে আদর করে যত্ন করে সাজিয়ে তুলেছে জীব-জন্তু, মানুষ, উদ্ভিদ, পরিবেশ আর পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর ইত্যাদির মালা দিয়ে। প্রকৃতির এই শান্তিপূর্ণ সাজানো সংসারকে আমরাই নিয়মিত ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছি, ধ্বংস করছি নানান অপকর্ম আর কৃত্রিম সংকট তৈরি করে, আর এরই মধ্যে একটি হল খাদ্যের সংকট। একশ্রেণির মানুষের দুর্নিবার লোভ প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে তছনছ করে দিচ্ছে। মনে পড়ছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা— "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়..."।

সেই খাদ্যসংকট থেকে বিশ্বব্যাপী মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে WFP ১৯৬১ সালে। এই সংস্থাকে শান্তির নোবেল প্রাইজ দেবার কথা ঘোষণার সময় নোবেল কমিটির মুখপাত্র বেরিস রিস-অ্যান্ডারসন বললেন, "Its efforts to combat hunger, for its contribution to bettering conditions for peace in conflict-affected areas and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict."

ভয়ংকর তথ্য হল, এই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রায় ৬৯ কোটি মানুষ প্রতিদিন না খেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় ঘুমিয়ে পড়ে, অর্থাৎ পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার ১১ জনের মধ্যে ১ জন অভুক্ত থাকে আজও। তাই ইউনাইটেড নেশনের ছাতার তলায় স্থিত WFP প্রতিষ্ঠান, যা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবহিতৈষী সংগঠন খাদ্যের ভান্ডার নিয়ে দেশে দেশে এইসব মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে নিয়মিত। গত বছরেই WFP প্রায় ৯ কোটি ৭০ লক্ষ অভুক্ত মানুষকে খাদ্য পৌঁছে দিয়েছেন ৮৮টি দেশের মধ্যে।

আর বর্তমানে করোনা-ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত অতিমারীর আবহে সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে এই সংস্থার কাজকর্মের তৎপরতাও বেড়েছে বহুগুণে। কারণ, মনে করা হচ্ছে খাদ্য-সরবরাহের প্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত ৬৯ কোটি অভুক্ত মানুষের উপরে আরও ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষ সংযুক্ত হবে এই ২০২০ সালেই।

WFP-এর এক মুখপাত্র বলছিলেন— "ক্ষুধার তাড়নায় যেমন যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তেমনি যুদ্ধের ফলে খাদ্যের অভাবও ঘটে এবং শান্তিপূর্ণ দেশগুলিতে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে যতটা অপুষ্টির কারণ ঘটে, তার চেয়ে অন্তত তিনগুণ অপুষ্টি দেখা যায় নিয়মিত সংঘর্ষে লিপ্ত দেশগুলির মানুষের মধ্যে।" তাই যুদ্ধ নয়, সংঘাত নয়, শান্তিই একমাত্র মানবতা প্রতিষ্ঠার পথ।

বর্তমানে WFP-এর প্রধান কেন্দ্রটি ইটালির রোমে অবস্থিত, প্রায় ৮০টি দেশে আছে এর শাখা। এই মুহূর্তে এই সংগঠনের শীর্ষ পদাধিকারী হলেন ডেভিড বিসলে। অভুক্ত, ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা দেওয়া, খাদ্য পৌঁছে দেওয়া এবং যুগপৎ সংঘর্ষশীল দেশগুলির মধ্যে শান্তির বাতাবরণ প্রতিষ্ঠা করাই WFP-এর উদ্দেশ্য। তাই এই বিশাল সংস্থাটিকে তার হিমালয়-প্রমাণ কাজকর্মের জন্য এবছর নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। WFP কিন্তু ভারতেও কাজ করছে সেই ১৯৬৩ সাল থেকেই।

এই নোবেল শান্তি পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে একটি স্বর্ণপদক, একটি ডিপ্লোমা এবং একটি এক কোটি সুইডিস ক্রোনর (১১ লক্ষ ডলার) মূল্যের চেক।

এই অর্থ অবশ্যই খাদ্য-সংকট থেকে উত্তরণের কাজে এবং অভুক্ত মানুষের পুষ্টি যোগাতে, দেশে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

email:sankarku_nath@yahoo.co.in • M. 9433309056

অ নি ন্দ্য দে

আপেক্ষিক তত্ত্ব ঃ একটি সহজ পাঠ

পূর্বকথা

গতি বিষয়টা আপেক্ষিক হলেও বস্তুর পরম গতি নির্ণয় করে ফেলাটা অসম্ভব কিছু নয়, এরকম একটা ভাবনা থেকেই তৈরি হয়েছিল ইথারের ধারণা। মাইকেলসন আর মর্লে ঝাঁপিয়েছিলেন সেই ইথারের অস্তিত্ব খুঁজে বের করার চেষ্টায়। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শুরু হল ইথার তত্ত্বকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে নানারকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের। এল বস্তুর দৈর্ঘ্য আর সময় সংকোচনের মত অদ্ভুত কিছু ধারণাও। ঠিক এই সময়েই এলেন আইনস্টাইন। মাইকেলসন মর্লের পরীক্ষায় ইথার বায়ু অস্তিত্ব ধরা পড়েনি কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর জবাব : ইথার বায়ু নেই তাই। সুতরাং পরম দৈর্ঘ্য আর পরম সময়েরও কোনও অর্থ নেই। সনাতন পদার্থবিদ্যার খোলনলচে বদলে দিয়ে আপেক্ষিক তত্ত্ব তাই ঘোষণা করল দৈর্ঘ্য আর সময় দুটোই আপেক্ষিক।

চতুর্থ পর্ব

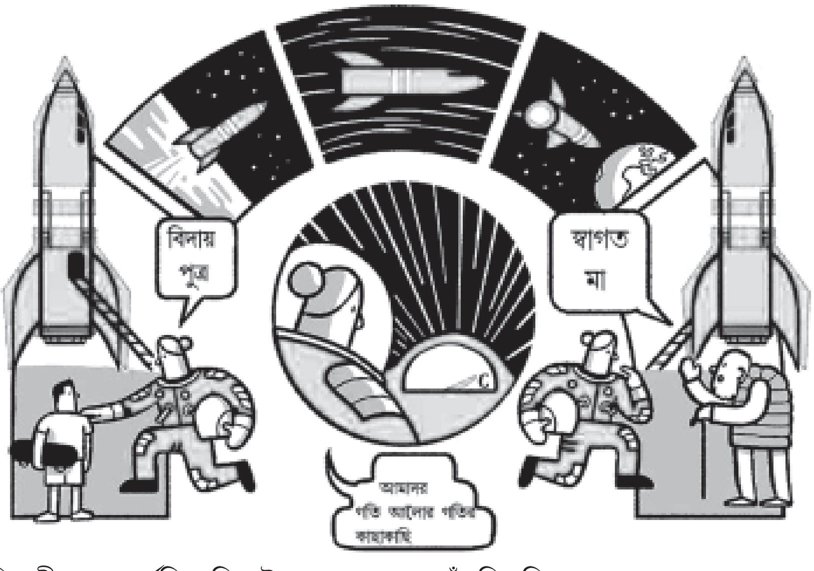

বিপ্লব তো না হয় শুরু হল। কিন্তু এই বিপ্লবের প্রতিঘাতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন সে সময়কার জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর দার্শনিকেরা? খুব স্বাভাবিকভাবেই, যে প্রতিক্রিয়াগুলো পাওয়া গেল সেগুলো মিশ্র জাতির। যেখানে সাধারণ বোধ-বুদ্ধির সাথে বিরোধ ঘটছে, বেশিরভাগ পদার্থবিদ আর জ্যোতির্বিদেরাই সেখানে চুপ করে রইলেন। আর যেসব বিজ্ঞানী আর দার্শনিক বিষয়টাকে বুঝতে পারলেন তাঁরা, যেমন স্যার আর্থার এডিংটন, একে গ্রহণ করলেন সাদরে। মরিৎজ সিল্ক, বার্ট্রান্ড রাসেল, রুডলফ কারন্যাপ, আর্নস্ট ক্যাসিরার, অ্যালফ্রেড নথ হোয়াইটহেড, হান্স রেইনচেনবাখ-এর মত প্রতিথযশা দার্শনিকেরা প্রবল উৎসাহে লেখালেখি শুরু করলেন এই তত্ত্বের গভীরতা নিয়ে। রাসেলের লেখা The ABC of Relativity বইটি জনমানসে সমাদৃত হল বিপুলভাবে।

তবে নিউটনীয় চিন্তা-পদ্ধতি থেকে হঠাৎ করে নিজেদেরকে সরিয়ে নিতে বেশ কিছু পদার্থবিদেরই বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। অ্যারিস্টটলের ভাবনা-চিন্তা ভুল ছিল—গ্যালিলিওর সময়কালে এটা মেনে নিতে যেমন অসুবিধে হয়েছিল, ঠিক তেমন। যার পরীক্ষার সূত্র ধরে আপেক্ষিক তত্ত্বের পথ প্রশস্ত হল, সেই মাইকেলসনও আপেক্ষিক তত্ত্বকে মেনে নিতে পারেননি।

বিপদ এল আরও একদিক থেকে। আমেরিকার নিউ ইংল্যান্ড ক্যাথলিক ক্লাবের সদস্যদের আপেক্ষিক তত্ত্ব বিষয়ক কোনকিছু পড়তে নিষেধ করে দিলেন বোস্টন শহরের আর্চবিশপ ও'কনেল। সদস্যদের উদ্দেশ্যে তাঁর সতর্কবার্তা "আপেক্ষিক তত্ত্বে ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে এমন কিছু অনুমান করা হয়েছে যা আপনাদের ভাবনা-চিন্তাকে ঘোলাটে করে দেবে...এখানে ছদ্মবেশে নাস্তিকতার ভয়ানক কুমন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে।"

এরকমভাবেই আপেক্ষিক তত্ত্বের সমালোচনা এবং স্তবগান, দুটোই চলছিল নানা দিক থেকে। তবে যে বিষয়টা নিয়ে সবথেকে বেশি আলোড়ন শুরু হল, তার সূত্রপাতটা কিন্তু হয়েছিল আইনস্টাইনের হাতেই। ১৯০৫ সালের গবেষণাপত্রে আইনস্টাইন নিজেই সেই প্রশ্নটা তুলেছিলেন। বিষয়টা হল দুই যমজ ভাইয়ের বয়সের মাপ নিয়ে একটি হেঁয়ালি, বিজ্ঞানের ভাষায় Twin Paradox। যুক্তির বিচারে অকাট্য হলেও বিষয়টা কিন্তু সাধারণ বোধ-বুদ্ধির বিরোধী। তাই এটা হেঁয়ালি। আর আজকের দিনে, মহাকাশ ভ্রমণের চূড়ান্ত উন্নতির যুগে, সময় মাপার যন্ত্রপাতির অভাবনীয় উন্নতির সময়ে, বিজ্ঞানের আলোচনায় বারেবারেই উঠে আসছে বিষয়টা। বিজ্ঞানীদের আশা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই হেঁয়ালির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাহলে সেই বিভ্রান্তিটাকে নিয়েই কিছু কথা বলে নেওয়া যাক।

হেঁয়ালিটা শুরু হচ্ছে এক কাল্পনিক পরীক্ষা দিয়ে। পরীক্ষাটা দুই যমজ ভাইকে নিয়ে। এদের মধ্যে একজন মহাকাশ ভ্রমণে যাবেন। যাত্রা শুরুর আগে দুই ভাই তাদের ঘড়িগুলোকে একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে নিলেন। তারপর এক ভাই চেপে বসলেন মহাকাশযানে। যান এগিয়ে চলল মহাশূন্যের দিকে। অন্য ভাই পৃথিবীর মাটিতে বসে রইলেন যমজ ভাইয়ের পথ চেয়ে। মহাকাশ ভ্রমণ সেরে কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন তিনি। মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে জড়িয়ে ধরলেন যমজ ভাইকে। কিন্তু পৃথিবীতে যিনি অপেক্ষা করছিলেন তিনি বেশ ধমকের সুরেই বলে উঠলেন, "মনের আনন্দে তুই পৃথিবীর বাইরে চলে গেলি। আর আমি এখানে বসে দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছি। এক ঘন্টা ধরে তোর কোনও পাত্তাই নেই!" মহাকাশচারী ভাই হো-হো করে হেসে উঠলেন। "কী উল্টোপাল্টা বকছিস! আমি তো মাত্র

পনেরো মিনিটের জন্য পৃথিবীর বাইরে ছিলাম। এই দ্যাখ, ঘড়ি দ্যাখ।”

বিপত্তিটা ঘটল এখানেই। ঘড়ি মেলাতে গিয়ে দুজনেই অবাক। যিনি মহাকাশযানে চেপে ভ্রমণে গিয়েছিলেন তার ঘড়ি যে কিছুটা কম সময় দেখাচ্ছে! তার মানে কি চলন্ত মহাকাশযানে সময় কিছুটা ধীরগতিতে এগোচ্ছিল? উত্তরটা পাওয়া গেল সেই আইনস্টাইনের কাছ থেকেই।

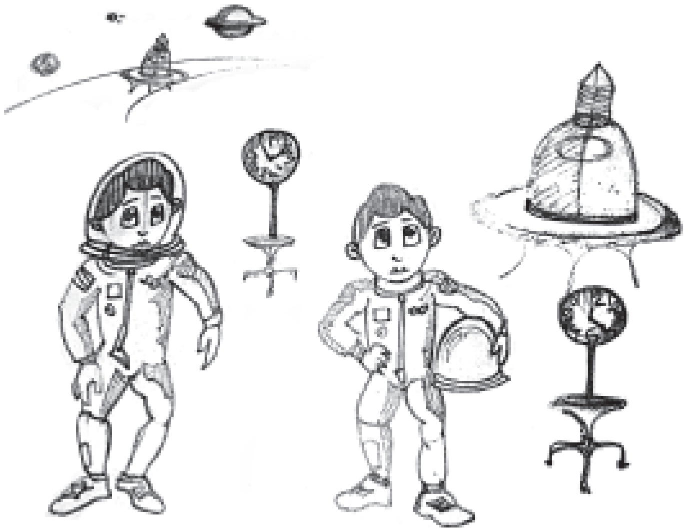

বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে তিনি বললেন, হ্যাঁ, এরকমটাই হওয়ার কথা। এই মহাকাশ যাত্রার ব্যাপারটা যদি আমাদের সৌরজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, আর মহাকাশযানের গতি যদি খুব বেশি না হয়, সেক্ষেত্রে হয়ত এই সময়ের পার্থক্যটা খুব বেশি হবে না কিন্তু দূরত্বটা যদি বেশ অনেকখানি হয় আর মহাকাশযানের বেগও যদি আলোর বেগের কাছাকাছি হয় এই সময়ের ব্যবধানটা (বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে বলে ‘কাল প্রসারণ’ বা Time Dilation) বেশ অনেকটাই বড় মাপের হবে।

ধরা যাক মহাকাশচারী ভাই এক হাজার আলোকবর্ষ (আলোকবর্ষ মানে হল এক সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে আলো এক বছরে যতটা দূরত্ব যায়) দূরে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা করছেন। যাত্রা শেষে তিনি আবার বাড়ি ফিরে আসবেন। কিন্তু পুরো ট্রিপটা শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকবেন তো? নাকি তার আগেই...? সেটা নির্ভর করছে তার মহাকাশযান কত জোরে ছুটবে, তার উপরে। যদি তার বেগ আলোর বেগের খুব কাছাকাছি হয়, মহাকাশযানের ভিতরে সময় খুব ধীর লয়ে এগোবে। এই ট্রিপ শেষ করতে তার কয়েক দশক লাগবে। কিন্তু পৃথিবীর মাটি থেকে দেখলে ঐ মহাকাশযানের পৃথিবীতে ফিরে আসতে সময় লেগে যাবে প্রায় হাজার দুয়েক বছর। এই যাত্রাটা যদি অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকার দিকে হয়, তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে? পৃথিবী থেকে অ্যান্ড্রোমিডার দূরত্ব প্রায় পনেরো লক্ষ আলোকবর্ষ। সুতরাং মহাকাশচারী যদি আলোর বেগের খুব কাছাকাছি কোনও বেগে ছুটতে পারেন, তাহলে হয়ত তিনি দেখবেন তার হিসেব অনুযায়ী পঞ্চান্ন বছর পরে তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারছেন। কিন্তু পৃথিবীর ঘড়ি অনুযায়ী সেই সময়ের ব্যবধান তো তিরিশ লক্ষ বছরের। অনেকদিন আগে, সেই ১৮৯৫ সালে লেখা H. G. Wells-এর গল্প “The Time Machine”-এর যাত্রীর মত তিনিও হয়ত দেখবেন পৃথিবীর মাটি থেকে পুরোপুরি মুছে গেছে মানব সভ্যতার ইতিহাস। বন্ধুবান্ধব-পরিবার কেউ আর তার সাথে নেই, একা তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এক মরুময় প্রান্তরে। ওয়েলস-এর গল্পের অভিযাত্রীর অবশ্য একটা সুবিধা ছিল। তার টাইম মেশিন ভবিষ্যতের দিকেও যেতে পারে, আবার অতীতের দিকেও যেতে পারে। আমাদের গল্পের মহাকাশচারীর কিন্তু সেই উপায় নেই। আজকের মানবজীবনে তার ফিরে আসার আর কোনও রাস্তা নেই। (আমরা এখানে যেসব হিসেব-নিকেশ করছি সেগুলো সবই কাল্পনিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে। বাস্তবে এই ধরনের মহাকাশ যাত্রার আসল সমস্যাগুলো কোথায় সেই ব্যাপারটা নিয়ে কোনও আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না। সে সম্পর্কে জানতে হলে A. G. W. Cameron সম্পাদিত Interstellar Communication (Benjamin, 1963) বইতে Edward Purcell-এর লেখাটি পড়ে দেখতে পারেন। সেখানে পার্সেল বলছেন, এই রকম একটা যাত্রার শেষে মহাকাশচারী যখন পৃথিবীতে ফিরে আসবে তখন মহাকাশযান, তার সমস্ত যন্ত্রপাতি, সব কিছু এত ছোট হয়ে যাবে যে, সেগুলোক অনায়াসেই একটা চালের বস্তার ভিতরে ঢুকিয়ে রাখা যাবে।) এই সমস্ত হিসেব-নিকেশ থেকেই শুরু হল নানান জল্পনা-কল্পনা। শুরু হল আজগুবি গল্পগাছা। ছোট্ট একটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি। বিখ্যাত Punch পত্রিকায় উদ্ভিদবিদ্যার এক অধ্যাপক A. H. Raginald Buller একটা লিমেরিক লিখলেন।

There was a young lady named Bright,
Who travelled much faster than light,
She started one day,
In the relative way,
And returned on the previous night.

কিন্তু মিস ব্রাইটকে যদি আত্মীয় বাড়ি রওনা হওয়ার আগের দিনেই ফিরে আসতে হত, তাহলে সেখানে নিশ্চয়ই তার নিজের একজন ডুপ্লিকেট কপির সাথে তার দেখা হয়ে যেত। যদি সেটা না হয়, তাহলে অবশ্যই তার পক্ষে আগের দিন রাতে ফিরে আসা সম্ভব নয়। কারণ বাড়িতে নিজের ডুপ্লিকেট কপির সাথে দেখা হওয়ার কোনও কথা মিস ব্রাইট মনে করতে পারছেন না। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে, এই ধরনের গালগল্পে স্ববিরোধিতা একেবারে স্পষ্ট। সমান্তরাল বিশ্বের[১] অস্তিত্ব ছাড়া সময়ের বিপরীতে এই ধরনের যাত্রা কোনভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার ধারণা থেকে গড়ে ওঠা কাল-প্রসারণের ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও এরকম নয়। সেখানে দীর্ঘায়ু লাভের বা অমরত্বের কোনও সুযোগ মানুষের নেই। মহাকাশচারীর

১. মহাবিশ্বের সংখ্যা কি একটাই? প্রশ্নটা নিয়ে তুমুল তর্ক বেধেছে আধুনিক পদার্থবিদদের মধ্যে। অনেকেই মনে করছেন, আমাদের এই মহাবিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এরকম আরও অনেক বিশ্ব। কিন্তু আমাদের জানা পদার্থবিদ্যা বলছে এই সমস্ত বিশ্বের সাথে কখনই আমরা যোগাযোগ করতে পারব না। এরাই সমান্তরাল বিশ্ব।

বয়স তার জীবনের স্বাভাবিক ছন্দেই এগোতে থাকবে। শুধুমাত্র মহাকাশচারীর দৃষ্টিতে পৃথিবীর 'নিজস্ব সময়'-এর হিসেবটা এক অস্বাভাবিক দ্রুততায় লাফাতে লাফাতে এগিয়ে যাবে।

কিন্তু সবাই যে এই যুক্তিটাকে খুব সহজভাবে মেনে নিলেন তা নয়। ফরাসি দার্শনিক হেনরি বার্গস তার নানান লেখায় Twin Paradox নিয়ে আইনস্টাইনের ভাবনা-চিন্তাকে উদ্ভট আখ্যা দিয়ে রীতিমত কৌতুক-নকশা লেখা শুরু করলেন। সেটা ছিল ১৯২৬ সালের ঘটনা। সময়ের সাথে সাথে এই সমালোচনার ঝড় অনেকটা স্তিমিত হয়ে এলেও একেবারে যে বন্ধ হয়ে গেছে তা বলা যায় না। ১৯৭০-এর দশকে ইংরেজ পদার্থবিদ হারবার্ট ডিঙ্গল নতুন করে আবার আইনস্টাইনের ভাবনা-চিন্তার বিরুদ্ধে সরব হলেন। তার মতে আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষজ্ঞরা হয় স্থূলবুদ্ধির মানুষ নয়ত তারা সমস্যাটাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। ডিঙ্গলের অভিযোগটা ছিল এরকম : আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারেই এই মহাবিশ্বে পরম গতি বলে কিছু নেই, কোনও একটা নির্দেশতন্ত্রকে 'তুলনায় ভালো' বলে বেছে নেওয়া যায় না। সেভাবে, পৃথিবীকে নির্দেশতন্ত্র হিসেবে বেছে নিলে মহাকাশচারী ভাই একটা সুদীর্ঘ যাত্রার শেষে বাড়ি ফিরে এসে যমজ ভাইয়ের থেকে নিজেকে যে বয়সে ছোট বলে আবিষ্কার করবে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মহাকাশযানটাকেই যদি নির্দেশতন্ত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়, তাহলে কী হবে? সেক্ষেত্রে পৃথিবী প্রথমে মহাকাশযান থেকে অনেক দূরে চলে যাবে, তারপরে আবার ফিরে আসবে। তাহলে পৃথিবীবাসী যমজ ভাইকেই বয়সে ছোট বলে মনে হবে। তার মানে সাধারণ বোধবুদ্ধি অনুযায়ী পুরো ব্যাপারটাই পরস্পর-বিরোধী। তাহলে ঐ দুই যমজ ভাইয়ের কারোর বয়সই অন্যজনের থেকে কম বলে মনে হবে না। ডিঙ্গল তাই বললেন, হয় যাত্রা শেষে দুই ভাইয়ের বয়স একই থাকবে অথবা আপেক্ষিকতার তত্ত্বটাকেই বাতিল করতে হবে।

যুক্তিটা জবরদস্ত হলেও একটা জায়গায় ডিঙ্গল বেশ বড়সড় একটায় ভুল করে ফেললেন। সমস্ত গতিই যে আপেক্ষিক সেটা ঠিক হলেও, মহাকাশচারী ভাইয়ের আপেক্ষিক গতি আর পৃথিবীতে বসে থাকা ভাইয়ের আপেক্ষিক গতি কিন্তু একরকমের নয়। কারণ, মহাকাশচারী ভাই তার চলার পথে মহাবিশ্বের সাপেক্ষে গতিশীল কিন্তু পৃথিবীতে বসে থাকা তার যমজ ভাই মহাবিশ্বের সাপেক্ষে স্থির, গতিশীল নন। তার ফলে কোনও একদিনের যাত্রা শেষ করে পৃথিবী বা মহাকাশযান যখন আবার দিক পরিবর্তন করে পুরনো জায়গায় ফিরে আসতে চাইবে, তখন তাদের যে বেগের পরিবর্তন হবে, মানে যে ত্বরণ হবে, সেটা দুজনের জন্য একরকমের হবে না। হিসেবের গরমিলটা হবে সেখানেই। অর্থাৎ, দুই যমজ ভাইয়ের বয়স হিসেব করার জন্য ত্বরণও যে গুরুত্বপূর্ণ সেটা ভুললে চলবে না। কিন্তু কীভাবে এই ত্বরণের হিসেব হবে? সে এক অন্য গল্প। সে গল্পে নয় অন্য কোনও এক সময়ে আসা যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত, টুইন প্যারাডক্স-এর হিসেব-নিকেশ আইনস্টাইনের দেখানো পথ ধরে চলবে, এটাই মেনে নেওয়া যাক; প্রায় সমস্ত বিশেষজ্ঞরাই সেটা মেনে নিয়েছেন।

এখন বরং অন্য একটা দিকে একটু নজর ফেরানো যাক। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ গড়ে ওঠার বেশ অনেকদিন থেকেই জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বের হাত ধরে এটা জানা গিয়েছিল যে, শূন্যস্থানে কোনও তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের শক্তি (E) আর তার ভরবেগের (p) মধ্যে সম্পর্কটা হল $E = pc$, যেখানে c হল শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ। এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই সম্ভব হয়েছিল আলোর বেগের নির্ভুল পরিমাপ করা। সুতরাং আলো যদি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ হয়ে থাকে, আর ফোটনের মধ্যে দিয়ে যদি তার কণাসত্তার প্রকাশ হয়ে থাকে, তাহলে ফোটনের ক্ষেত্রেও এই সম্পর্কটা প্রযোজ্য হবে। এই ধারণাটাকে মাথায় নিয়েই ১৯০৬ সালে আইনস্টাইন একটা কাল্পনিক পরীক্ষার কথা ভেবে ফেললেন। M ভর আর L দৈর্ঘ্যের

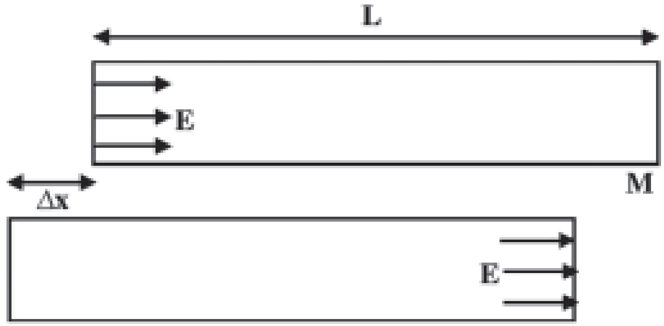

আইনস্টাইনের কাল্পনিক পরীক্ষার রেখাচিত্র

একটা বাক্সকে এমনভাবে স্থির অবস্থায় রাখা আছে যে বাইরের পরিবেশের সাথে তার কোনও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। এই অবস্থায় বাক্সের ভিতরের কোনও একটা প্রান্ত থেকে E শক্তির কিছু বিকিরণ নির্গত হল; সেক্ষেত্রে বিকিরণের ভরবেগ E/c। কিন্তু বাইরে থেকে কোনও বল প্রযুক্ত হয়নি বলে, পুরো ব্যবস্থার ভরবেগকেই সংরক্ষিত হতে হবে। তার মানে বাক্স বিকিরণের গতিপথের উলটো দিকে -E/c পরিমাণের একটা ভরবেগ পাবে। অর্থাৎ, বাক্স বিকিরণের উল্টোদিকে $v = -E/Mc$ (যেহেতু বেগ = ভরবেগ/ভর) বেগ নিয়ে ছুটতে শুরু করবে। ধরা যাক, Δt সময় পরে বিকিরণ বাক্সের অপর প্রান্তে পৌঁছেছে। তাহলে $\Delta t = L/c$ হবে, কারণ বিকিরণের বেগও আলোর বেগের (c) সমান। এই প্রান্তে পৌঁছে ঐ বিকিরণ যে আঘাতটা হানবে সেটা শুরুর সময়ে অন্য প্রান্তে যে ধাক্কা দিয়ে সে দৌড় শুরু করেছিল তার সমান কিন্তু উল্টোদিকে হবে। আর তার ফলে বাক্সটাও থেমে যাবে। ঐ Δt সময়ে বাক্স যদি বিকিরণের গতিপথের উল্টোদিকে Δx দূরত্ব এগিয়ে থাকে, তাহলে $\Delta x = v.\Delta t = -EL/Mc^2$। এক্ষেত্রে যদি বিকিরণের সাথে সংশ্লিষ্ট একটা তুল্য ভর (m) আমরা ধরে নিতে পারি, তাহলে $mL+M.\Delta x = 0$ হবে। আর সেখানে $\Delta x = -EL/Mc^2$ বসিয়ে দিলেই আমরা পাব, $m = E/c^2$, অর্থাৎ সেই বিখ্যাত সমীকরণ,

$$E = mc^2$$

সহজ কথায়, বিশেষ কিছু শর্তে পদার্থের ভর যেমন শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, আবার শক্তিও ভরে রূপান্তরিত হতে পারে। তার মানে

রকেটের মোটর যখন মহাকাশযানের বেগ বাড়াতে চাইবে তখন মোটরের শক্তির একটা অংশ মহাকাশযানের ভর বাড়িয়ে দিতে চাইবে। চায়ের জল গরম করতে গেলে পাত্রের ভর কিছুটা বেড়ে যাবে, জল ঠান্ডা হয়ে গেলে সেই বাড়তি ভর আবার উধাও হয়ে যাবে শক্তি হিসেবে। ঘড়িতে দম দিলে স্প্রিং-এর ভর কিছুটা বাড়বে, আবার ঘড়ি চলতে চলতে গোটানো স্প্রিং পুরো খুলে গেলে ভর কমে আসবে। অর্থাৎ কয়েকশো বছর ধরে আমরা যে শিখে আসছিলাম, এই মহাবিশ্বের মোট ভর যেমন অবিনশ্বর, মোট শক্তিও সেরকমই অপরিবর্তনীয়, সেই জায়গাটাই বদলে গেল আইনস্টাইনের এই ছোট্ট সমীকরণের দৌলতে। আমরা শিখলাম 'ভর-শক্তির' সংরক্ষণের কথা। ব্যাপারটা বেশ মজাদার। কিন্তু ভর বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়ার পরিমাণ এতটাই কম যে আমাদের রোজকার জীবনের হিসেব-নিকেশের ক্ষেত্রে একে বাদ দিয়ে দিলেও কোনও অসুবিধা হয় না।

তবে সবসময়ে যে হিসেবটা খুন নগণ্য হয় তা কিন্তু নয়। সূর্য থেকে আমরা যে নিরন্তর শক্তি পেয়ে চলেছি সেটাও তো এই ছোট্ট সমীকরণটারই ফল। সূর্যের প্রবল অভিকর্ষের টানে অভ্যন্তরের চাপ প্রচন্ড পরিমাণে বেড়ে গেলে উষ্ণতাও বেড়ে যায় অনেকখানি।

হিরোসিমায় পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ

আর সেই অত্যধিক উষ্ণতায় হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করতে থাকে হিলিয়াম। সেই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াতেই বেশ কিছুটা ভর রূপান্তরিত হয় শক্তিতে। সেই শক্তিই গত পাঁচশো কোটি বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের পৃথিবীকে। আমাদের এই ধরিত্রীর বুকে জীবন-প্রবাহের একমাত্র কারিগর ঐ সৌরশক্তি।

কিন্তু এই মুহূর্তে এসে মনে হচ্ছে পৃথিবী থেকে প্রাণের বিনাশও ঘটবে বোধ হয় এই সমীকরণের হাত ধরেই। মানব সভ্যতার ইতিহাসের কদর্যতম ধ্বংসলীলা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরমাণু বোমার নারকীয় হত্যালীলা, তার প্রাণ-ভোমরাও তো এই সহজ-সরল সমীকরণটাই। সেই সময়টাকে অনেকটা দূরে ফেলে এসেও আজও যেন রাজনৈতিক সমীকরণ কিছুতেই আইনস্টাইনের এই সমীকরণটাকে কাছ-ছাড়া করতে চাইছে না। তবে ধ্বংসের এই লালসার ছবিটা কিন্তু নেহাতই একটা খন্ডচিত্র। ভালো উদ্যোগ বরং অনেক। পদার্থের মৌলিকতম উপাদানের খোঁজে নিরন্তর

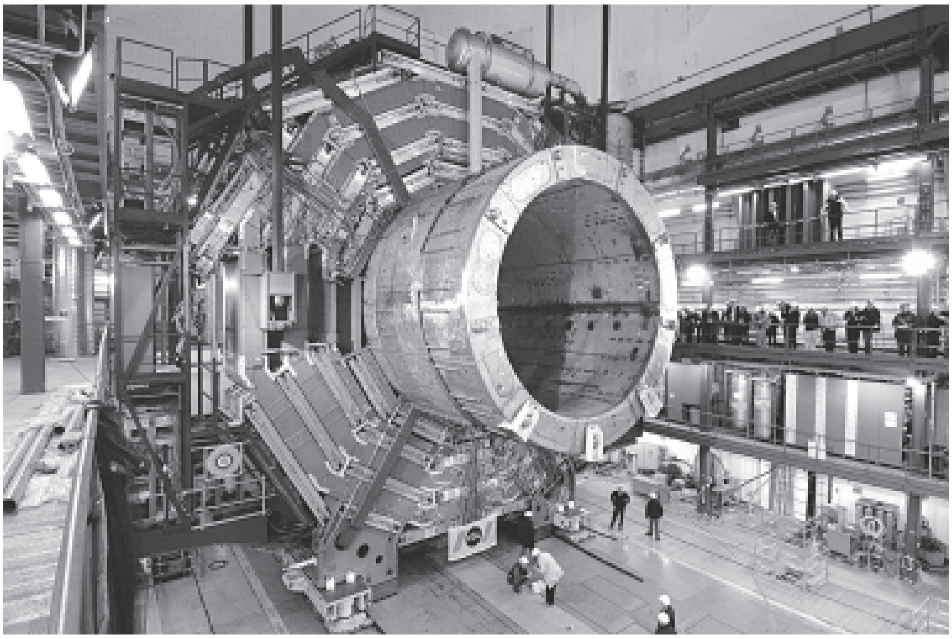

বড় হ্যাড্রন কোলাইডার

চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অসংখ্য বিজ্ঞান-তাপস। ইলেকট্রন-প্রোটনের মত কণাগুলোকে প্রচন্ড শক্তিতে ধাক্কা লাগিয়ে দেখতে চাওয়া হচ্ছে তারা ভাঙে কি না, আর ভাঙলেই বা কী তৈরি করে। কিন্তু তাদের শক্তি বাড়াতে গেলে তাদের ভর বাড়াতে হবে। আর তার জন্যেই তাদেরকে ছোটাতে হবে প্রচন্ড গতিতে। সেই উদ্দেশ্যেই তৈরি হচ্ছে বড় বড় অ্যাকসেলেরেটর, কোলাইডার। ল্যাবরেটরির গবেষণায় কাল প্রসারণের প্রমাণও মিলেছে বাস্তবে। দ্রুত গতির মেসন কণার গড় জীবনকাল কম গতির মেসনের থেকে বেশি, এটা দেখা গেছে। কারণ ঐ মেসন কণা যখন প্রচন্ড গতিতে ছুটবে তার ঘড়ি যে স্লো চলবে, আপেক্ষিকতাবাদ তো সেরকমই বলছে।

আবার কোনও কণা যখন তার বিপরীত কণার (একই ভরের বিপরীত আধানের কণা) সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন দুজনেই বিনষ্ট হয়ে তৈরি করে বিকিরণ। ক্ষণস্থায়ী কণার ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা ল্যাবরেটরিতে দেখা হয়েছে। অ্যান্টি-ম্যাটার বা প্রতি-বস্তুকণা (বিপরীত কণা দিয়ে তৈরি বস্তু কণা) তৈরি হলে, অদূর ভবিষ্যতে পারমাণবিক শক্তির চূড়ান্ত চেহারাটা আমরা দেখতে পাব বলেই মনে হয়। মহাকাশযানের মধ্যে উপযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে ধরে রাখা অল্প কিছু পরিমাণ অ্যান্টি-ম্যাটার ক্রমাগত বাস্তব বস্তুকণার সাথে যুক্ত হয়ে যে বিপুল শক্তি তৈরি করবে, তার সাহায্যেই মহাকাশযান পাড়ি দেবে ব্রহ্মান্ডের অতল গভীরে। কারণ, দেশ-কালের গঠনটা ঠিক কেমন সেটা আমাদের জানতে হবে তো!

email:anindya05@gmail.com • M. 9432220412

ম ন তো ষ মি ত্র

পরম মানের গল্প

একটা দিন ছুটি পেলেই হয় পাপান বা পাপানের ভাই তাতান আসবেই। ওদের দুই ভাই-এর প্রতি কেমন যেন একটা দুর্বলতাই জম্মে গেছে। না এলে ভাল লাগে না। সেদিন পাপান এসে বলল স্যার আবার আপনার শরণাপন্ন হলাম। বললাম—কি ব্যাপারে এত শরণাপন্ন হলে? বলছি স্যার বলে পাপান গতদিনের ক্লাসনোটের খাতাটা বের করে দেখাল। দেখলাম হুবহু বইতে যা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—সেটিই নোটের আকারে লিপিবদ্ধ। ফলে উপলব্ধির অভাবে পাপানের মুখভার। ওর খাতায় লেখা যা ছিল তা হুবহু তুলে দিই পাঠকের বোঝার স্বার্থে। একটি অপেক্ষককে মডিউলাস অপেক্ষক (modulus fametic) বা পরম মান অপেক্ষক (absolute value function) বলা হবে যদি

$$f(x)=\begin{cases} x \text{ যখন } x>0 \\ 0 \text{ যখন } x=0 \\ -x \text{ যখন } x<0 \end{cases}$$ হবে।

নোট খাতাটির দিক থেকে চোখ সরিয়ে পাপানের দিকে তাকাতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার মুখের উপর একরাশ বিরক্তির ছাপ দেখলাম। বুঝলাম স্কুলের পাঠদান পদ্ধতিতে পাপান খুশি নয়। পাপান পাঠ্যবিষয়কে উপলব্ধির স্তরে না আসা পর্যন্ত শান্ত হয় না। তাই বললাম বুঝেছি—'পরম মান' অপেক্ষক নিয়ে কিছু বলতে হবে। তাইতো? পাপান মাথা নেড়ে উত্তর করল—হ্যাঁ স্যার। একটু উপলব্ধি হলেই কিন্তু অনেকটা পথ একা হাঁটা যায়। ওর কথা শুনে বুঝলাম—না শুনে আজ যাবে না। তাই বললাম—আজ আর একটু গল্প মিশিয়ে রসিয়ে বলব। গল্প শুনতে পাপান রাজী। পাপান এককথায় বলে উঠল—স্যার আপনিই তো বলেন অঙ্ক কখনও অঙ্ক দিয়ে শেখা যায় না। অঙ্ক শিখতে হবে গল্প দিয়ে। তবেই অঙ্ক-শিক্ষা উপলব্ধির জগতে পাখা মেলবে। পাপান আমারই কথা আমাকে ফেরত দিয়ে বসে পড়ল মন দিয়ে শুনতে। হাতের দু-একটা কাজ সেরে এসে বসলাম পাপানের সামনে। বললাম—দেখো পাপান তোমার খাতায় স্যারের লেখানো নোটের প্রতিটি কথাই সঠিক। আসলে সংজ্ঞাকরণ অত্যন্ত গাণিতিকভাবে হওয়ায় তোমরা কেউই উপলব্ধি করতে পারোনি। তাই নয় কি? পাপান বলে উঠল হ্যাঁ সার, ঠিক বলেছেন। ওর স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর শুনে বললাম—অঙ্কের বিষয় মুখস্থ করে মস্তিষ্কে ধারণ করে তা উপলব্ধি না করতে পারলে ব্যর্থ সময়ের গ্লানিই বয়ে বেড়াতে হয়। এই প্রক্রিয়া কেবল সময়ের অপচয়ই নয়। বিষয়ের ভার বিষয়কে শিক্ষার্থীর থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এবং বিজ্ঞান শিক্ষা হয়ে ওঠে যান্ত্রিক। তাই উপলব্ধির জগতে পৌঁছতে একটা মজার গল্প বলব। কেমন! খুশিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পাপানের। বনগাঁ লোকালের কথা তো তোমরা সবাই জান। শিয়ালদা সেকসনের সবাই জানে। ভিড়ের জন্য। তো এক ব্যক্তি মাঝপথে কোনরকমে উঠতে পারল। খুব কষ্টে দাঁড়ানোর মত একটা জায়গা তৈরি করেছে। এবার হাতের ব্যাগটা কোনরকমে বাঙ্কারে তুলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ট্রেন দমদম পৌঁছতেই হঠাৎই খেয়াল করলেন বাঙ্কারে রাখা ব্যাগটা খোয়া গিয়েছে। কোন এক সুযোগ সন্ধানী ব্যাগটি আত্মস্থ করে নেমে গেছেন। ব্যক্তিটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে ব্যাগের হদিস পেলেন না। তাই কি আর করা। শুধু মনে মনে আফশোস করছেন দুপুরের টিফিনে গলদা চিংড়ির মালাইকারী

আর পাবদার ঝাল দিয়ে খাওয়াটা ফসকে গেল। বরং বাড়তি একটি টিফিন বাক্সও গেল। কি আর করা যাবে বলে ভাগ্যকেই দোষারোপ করে অফিসে চলে গেলেন। ছুটকির জন্মদিনের খাওয়াটা এভাবে শেষ হয়ে যাবে ভাবতেই পারেননি ভদ্রলোক। সারাদিন কাজে মন বসল না। আর ওদিকে সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি ওই টিফিন বাক্স বাড়িতে এনে খুলে তো চক্ষু চড়কগাছ তার। এত সুন্দর সুন্দর খাবার খেয়ে বেশ একটা দিবানিদ্রা দিয়ে নিল। কিন্তু ঐ সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তির লোভ আর সাহস গেল বেড়ে। দ্বিতীয়দিন সে আবার একটা সুযোগ নিল। ব্যাগটা ভারী ভেবে খুব আনন্দে বাড়ি ফিরল। এরপর ব্যাগ খুলতেই দেখল বাক্সটা পাথরের। তাই এত ভারী। আর পেটটা একদম ফাঁকা। খুব মনক্ষুন্ন হল। কিন্তু কি আর করা। তৃতীয়দিনের জন্য সে প্রস্তুতি নিয়ে উঠে পড়ল একটা কামরায়। যে কামরায় প্রথমদিন সে উঠেছিল। পুরনো দিনের পুনরাবৃত্তিকে মাথায় রেখে। আর প্রথম দিনের সেই ব্যক্তি টিফিন বাক্স হারিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল আগন্তুককে একহাত নেওয়ার। সেদিন টিফিন বাক্সটা সিটের নীচে রেখে বাঙ্কারে তুলে রাখল একটা অন্য বাক্স। একদম একই রকম ব্যাগের মধ্যে পুরে। এরপর যাত্রাপথের কোনও এক সময়ে লক্ষ্য করে দেখল বাক্সটি চুরি গেছে। আর এই চুরির ঘটনায় ভদ্রলোক একদম আফশোস না করে কেবল হেসে চলেছেন। সহযাত্রীরা যত জিজ্ঞাসা করেন, ভদ্রলোক ততই হেসে চলেন। শেষে বললেন—এবার মুখের মত জবাব দিয়েছি। অনেক চাপাচাপির পর যা জানা গেল ঐ বাক্সে ছিল তার বাবার মল। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মল পরীক্ষা করার জন্য ল্যাবরেটরিতে দেওয়ার কথা ছিল। তাহলে বোঝাই গেল—এত হাসির কারণ কি? এই পর্যন্ত বলে পাপানকে বললাম—তৃতীয় দিন কৌটো খুলে সুযোগ সন্ধানীর কেমন দিন কাটল বুঝতে পেরেছ। পাপান শুধু হো হো করে হাসছে। বললাম—এই গল্পের মধ্যে অঙ্ক কতটুকু? গল্পের কোন অংশটুকু ফেলতে হবে, আর কোন অংশ গাণিতিকভাবে উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করবে বুঝতে পেরেছ? পাপানের নির্বাক মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, দেখো পাপান ঐ সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি তিনটি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রথমটির ক্ষেত্রে তার চাহিদার নিরিখে তার প্রাপ্তি পূর্ণতা পেয়েছে। অর্থাৎ ঘটনাটা পজিটিভ বা ধনাত্মক ভাবা যেতে পারে। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তার চাহিদার প্রেক্ষিতে কেবলই শূন্যতা। কিছু জোটেনি। আর তৃতীয় ঘটনাটির ক্ষেত্রে তার চাহিদার সাপেক্ষে একেবারে নেতিবাচক ঘটনা। আর কৌটোটা তো একটা Symbol মাত্র। এক্ষেত্রে modulus চিহ্নটা কৌটোর ভূমিকায় দেখানো হয়েছে।

আসলে এই modulus (মডিউলাস) চিহ্নটা কেবলমাত্র সাংখ্যমান তথা স্কেলার ভ্যালুকে প্রকাশ করে। যেমন বনগাঁ-শিয়ালদার কুড়ি টাকার মূল্যের যাত্রাপথের টিকিট আর শিয়ালদা-বনগাঁর কুড়ি টাকার মূল্যের যাত্রাপথের টিকিট তো আর এক নয়। কিন্তু অর্থমূল্যটা একই। কুড়ি টাকা। পরমমান কেবলমাত্র ঐ কুড়ি টাকার কথাই বলে। অর্থাৎ পরমমান হল একটি স্কেলার রাশি। যার কেবল মান আছে, কোনদিকের অভিমুখ নেই। যেটি

$|x| = x,\ x>0$
$\quad = 0,\ x = 0$
$\quad = -x,\ x<0$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

এইবার গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ করতে বোঝা যায়, $+x$ হল x অক্ষের উপর মূলবিন্দু থেকে ধনাত্মক x অক্ষের দিকে x একক দূরত্বের বিন্দু। অনুরূপে, $-x$ হল, x অক্ষের উপর মূলবিন্দু হলে ঋণাত্মক x অক্ষের দিকে x একক দূরত্বের বিন্দু। অর্থাৎ রাশি দুটির মান এক হলেও অবস্থানের অভিমুখ ভিন্ন। অর্থাৎ $|x|$হল তিনটি ভিন্ন অবস্থার এক ও অভিন্ন রূপ তথা স্কেলার রাশি। আর তিনটি ভিন্ন অবস্থান হল তার ভেক্টর অবস্থানের প্রকাশ। অর্থাৎ $|x|$ হল প্রকৃত অর্থে একটি স্কেলার রাশি। একই অঙ্গে তিনটি রূপের ধারণ ক্ষমতার প্রকাশ। এইবার পাপান খুব খুশি হয়ে বলল স্যার বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পারা মুখের চেহারা সত্যিই যে কত সুন্দর, তা একবার যে প্রত্যক্ষ করে সেই বোঝে। সেদিনের মত পাপান বিদায় নিলে আমারও সেদিনের মত মুক্তি ঘটল।

রহস্যের অন্তরালে

(লাভ-ক্ষতি জনিত সমস্যার চরম বা পরম মানের স্পর্শ)

সেদিনও পাপান আর পাপানের ভাই তাতান জোড় মানিক এসে হাজির। এসেই বলল—আমাদের দুজনকেই একসঙ্গে আসতে বলেছিলেন। কি এক নতুন কথা শোনাবেন বলে, তাই স্যার আজকে এলাম। যদি আপনার সময় থাকে তবেই শুনব, নইলে নয়। বললাম—তোমাদের সময় হলেই আমার সময় ঠিক করে নেব। হ্যাঁ একটা জিনিস মাথায় ঘুরছে সেটি তোমাদের শোনাতে চাই। বোসো। এরা দুই ভাই খাটের উপর উঠে বসল। আমি একেবারে খাতা, পেন্সিল, স্কেল নিয়ে বসলাম। বললাম—নতুন কিছু শোনাব। আসলে সবকিছু বাজিয়ে দেখতে দেখতেই নতুন কিছু রূপ চোখে পড়ে। বুঝলে পাপান—পেশাগত জীবনে গতানুগতিকতার পথ চেয়ে সামাজিক ক্ষেত্রে ঘটমান স্রোতের দিকে তাকালে এমন অনেক কিছুই চোখে পড়বে, যা তোমাকে নতুন করে ভাবতে, শিখতে সাহায্য করবে। নতুন কিছু সৃষ্টির উদ্দামতায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। শিক্ষকতা জীবনের বড় সীমাবদ্ধতা হল গতানুগতিকতার প্রতি নিঃশব্দ সারবদ্ধতা। নতুন কিছু খুঁজে দেখার চেষ্টায় কোথাও যেন এক চরম শূন্যতা। এই শূন্যতাকে ছুটি দিতেই তো নিজেকে ব্যস্ত রাখা চুলচেরা বিশ্লেষণে, যদি খোঁজ মেলে নতুন কিছুর এই আশায়।

আসলে গণিত হল ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন বা প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা ঘটনার স্রোতের গাণিতিক সংক্ষিপ্ত ও সরল প্রতিকীকরণ। আজ যে গণিতের চর্চা চলছে তাতো বহুকাল আগেই সৃষ্টি হয়েছে। তখন সমাজ জীবন যে অর্থে প্রকাশিত হত বর্তমান সময়ের জীবন-প্রবাহ, বাণিজ্য কিন্তু হুবহু সেই একই গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত নয়। সামাজিক বহু পরিবর্তন তথা গাণিতিক ভাষায় সংযোজন-বিয়োজনে বর্তমান সময় অনেক বেশি আধুনিক। কিন্তু এই আধুনিক জীবন প্রবাহের গাণিতিক রূপান্তরে আধুনিকতার স্পর্শ তেমনভাবে লাগেনি। তারই এক নমুনা তোমাদের আজ দেখাব। এইটি

মাথায় আসে যখন ক্লাসরুমে লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধান শিখিয়ে বাড়ি ফেরার পথে চৈত্রের সেলের দিকে নজর রাখি। রাস্তার সামনে ঝুলতে থাকা বোর্ডে বড় বড় হরফে কোথাও 20%, কোথাও 30% বা কোথাও স্টক ক্লিয়ারেন্সের দোহাই দিয়ে 50% পর্যন্ত কম দামে বিক্রির বিজ্ঞাপনের ঝলক। তখনই প্রশ্ন জাগছে মনে, বাস্তবের বিক্রয় প্রক্রিয়া কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া নয়। বিক্রয় প্রক্রিয়াটি সময়ের উপর নির্ভরশীল একটি প্রক্রিয়া। তাহলে পাপান কি দাঁড়াল শেষে? ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত প্রক্রিয়াটি তাৎক্ষণিকও হতে পারে। আবার বিক্রয় সময়ের প্রতি নির্ভরশীল একটি প্রক্রিয়াও হতে পারে। অর্থাৎ স্থির একটি লভ্যাংশের অভিমুখও যেমন থাকতে পারে। পরিবর্তনশীল লাভের একটা অভিমুখও থাকতে পারে। যেমন, পচনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় তাৎক্ষণিক হলে লভ্যাংশের হার স্থির থাকে। কিন্তু এই পচনশীল বস্তুর বিক্রয় পর্যায় সময়ের উপর নির্ভরশীল হলে লভ্যাংশের হার কমে যায়। শুধু তাই নয়। ক্ষতিরও ঝুঁকি থাকে। আবার সময়ের সাপেক্ষে দাম বাড়ে এরূপ পদার্থের (সোনা, জমি... ইত্যাদি) ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বিক্রয়পর্বে লভ্যাংশের হার স্থির থাকে। আর বিক্রয়পর্ব সময়ের উপর নির্ভরশীল হলে লভ্যাংশও পরিবর্তিত হতে থাকে। এখন প্রশ্ন হল পরিবর্তনশীল এই বাজারী ঘটনার প্রতিফলনে গণিত ব্যর্থ হল কেন? সেই দায়বদ্ধতা থেকেই অন্যভাবে বিষয়টি দেখার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও মাধ্যমিকে গণিতের পাঠ্যসূচিতে 'লাভ-ক্ষতি' পরিচ্ছদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেখানে লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত সমস্যায় বিক্রয়পর্ব নামক পর্যায়টি যে সময়ের প্রতি নির্ভরশীল তা কোথাও প্রতিফলিত নয়। বিক্রয়পর্ব এককালীন বা তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া হিসাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। মূল্যসূচককে স্থির ধরে ক্রয়পর্ব এককালীন বা তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া হিসেবে ধরে নিলেও বিক্রয়পর্ব কখনই তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। "বিক্রয়পর্ব" সাধারণতঃ একটা দীর্ঘ সময়কালীন প্রক্রিয়া। এই দীর্ঘ সময়ে বিক্রয়দ্রব্যের পচন বা নষ্ট জনিত ক্ষতি লভ্যাংশের হারকে প্রভাবিত করে বা বিক্রিত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে লভ্যাংশের হার বৃদ্ধি পেয়ে লভ্যাংশের হারকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় যে, 'বিক্রয়পর্ব' তাৎক্ষণিকও হতে পারে আবার দীর্ঘ গর্ভে পরিবর্তনশীল লাভ-ক্ষতির দ্বারা সিদ্ধ হতে পারে। এককথায় বিক্রয়মূল্যে সময়ের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না বা লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত আলোচনায় একটা নতুন মাত্রা 'সময়ের' সংযোজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। সমস্যাটি অনুধাবন করা ও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার জন্য একটা উদাহরণ তুলে ধরলে স্পষ্ট ধারণা করা যাবে যে, গতানুগতিক ঢঙে প্রশ্ন ছাত্রমহলে ছুঁড়ে দেওয়া যাবে না। প্রশ্নকে আরও নিখুঁতভাবে শিক্ষার্থী মহলে তুলে ধরতে হবে যাতে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। সমস্যাটি সময়ের প্রভাব থেকে মুক্ত নয় সময়ের প্রভাবে সমস্যাটি দীর্ণ। স্পষ্টতই সমস্যাটি সময়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হলে, বিক্রয়মূল্য অপরিবর্তিত থাকে। ফলে লাভের হার হয় সর্বোচ্চ এবং সমস্যাটি সময়ের গর্ভে প্রোথিত হলে বিক্রয়মূল্য পরিবর্তিত হতে থাকবে এবং লভ্যাংশের হারও পরিবর্তিত হতে থাকবে। অর্থাৎ নতুন মাত্রা সময়ের সংযোজনে 'লাভ-ক্ষতি' সংক্রান্ত সমস্যায় চরম বা অত্যধিক মানের ছোঁয়ায় গণিত আরও বেশি সূক্ষ্ম ও প্রাণবন্ত হবে। প্রয়োগের আঙ্গিকে পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে একটু স্পর্শকাতর হলেও গণিত হবে সূক্ষ্ম আধুনিক ও প্রকৃত লাভ নির্ণয়ে একটি সঠিক পদক্ষেপ। এরপর তাকালাম দুই ভাই-এর দিকে। বললাম—কি বুঝলে কিছু? কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর পাপান বলল—অন্তত একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। বললাম—এইবার উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা দেব। বলে একটা উদাহরণ (সমস্যা) লিখিত আকারে তুলে ধরলাম। সমস্যাটি নিম্নরূপ ঃ— "কোন দ্রব্য টাকায় পাঁচটি কিনে টাকায় তিনটি করে বিক্রি করলে শতকরা লাভ কত?" এই প্রশ্নে সমাধান দুটি উপায়ে করার চেষ্টা করব। প্রথম প্রকার পদ্ধতিতে যেখানে বিক্রয় তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া। যেমন— পাঁচটির (5) টির ক্রয়মূল্য = 1 টাকা

তিনটির (3) টির বিক্রয়মূল্য = 1 টাকা

" 1 " " = $1/3$ টাকা

" 5 " " = $5/3$ টাকা

$\therefore$ লাভ = বিক্রয়মূল্য — ক্রয়মূল্য

$= \frac{5}{3} - 1 = 2/3$ টাকা

$\therefore$ শতকরা লাভ $= \frac{2}{3} \times 100 = \frac{200}{3} = 66\,2/3\,\%$

এই ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ভাবে ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বিক্রয়মূল্য সময়ের গর্ভে প্রোথিত ছিল না। আর দ্বিতীয় প্রকার পদ্ধতিতে বিক্রয়পর্ব সময়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন,

পাঁচটির (5) টির ক্রয়মূল্য = 1 টাকা

আবার তিনটির (3) টির বিক্রয়মূল্য = 1 টাকা

তাই, তিনটি বিক্রয়ের সাথে সাথেই তার ক্রয়মূল্য হস্তগত হয় এবং ব্যবসাকে ঝুঁকিমুক্ত করে এবং অবশিষ্ট 2টি দ্রব্যের ক্রয়মূল্যই হল তার লাভের কড়ি। দুটির ক্রয়মূল্য = $2/5$ টাকা।

$\therefore$ শতকরা লাভ $= \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$

এখন প্রশ্ন হল একই সমস্যার দুটি ভিন্ন সমাধান সম্ভব হয় কি করে? তাহলে কোনটি সঠিক? আর কেনই বা সেটি সঠিক? —ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আসলে প্রথম প্রকার সমাধান পদ্ধতিতে ক্রয় ও বিক্রয় এর শর্ত তাৎক্ষণিকভাবে অর্থাৎ সময়ের প্রভাব মুক্ত হয়ে প্রতিফলিত। তাই সময় জনিত কোন প্রকার ক্ষয়-ক্ষতি থেকে সমস্যাটি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকায় লাভের হার হয় সর্বোচ্চ।

পদ্ধতিটি ঐকিক নিয়মের অতি সরলীকরণ এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ক্রয়ের শর্ত অপরিবর্তিত। কিন্তু বিক্রয়মূল্যর শর্ত ততক্ষণই ক্রিয়াশীল যতক্ষণ না ক্রয়মূল্য হস্তগত হয়। তারপর ব্যবসাগত ঝুঁকি না থাকায় বিক্রয়মূল্যের শর্ত ক্রিয়াশীল থাকে না। (চৈত্র মাসের সেল বা রিবেটে বিক্রি যার স্পষ্ট উদাহরণ)। এরপর পড়ে থাকা অবিক্রিত বস্তুর ক্রয়মূল্যই হল সর্বনিম্ন লাভ। এক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য সময়-জনিত দীর্ঘসূত্রতার দোষে দুষ্ট, যেহেতু বিক্রয়পর্ব সময় নামক পর্বের উপর বড় বেশি নির্ভরশীল। এই তৃতীয় দিশা 'সময়' এর পরোক্ষ প্রভাবে একই সমস্যার দুটি উত্তর দেখা যায়। প্রথম সমাধানটি সেইক্ষেত্রে সঠিক

হবে যখন প্রশ্নটি হবে— "কোন দ্রব্য টাকায় পাঁচটি কিনে টাকায় তিনটি বিক্রি করলে লাভের **'সর্বোচ্চ'** শতকরা হার কত?" এবং দ্বিতীয় সমাধানটি সেইক্ষেত্রে সঠিক হবে যখন প্রশ্নটি হবে— "কোন দ্রব্য টাকায় পাঁচটি কিনে টাকায় তিনটি বিক্রি করলে লাভের **'ন্যূনতম'** শতকরা হার কত?

অর্থাৎ উপরিউক্ত সমস্যাগুলি ত্রুটিমুক্ত করতে এবং 'লাভ-ক্ষতি' নামক পরিচ্ছদে 'সর্বোচ্চ' ও 'সর্বনিম্ন' বা 'ন্যূনতম'—তার ধারণা দেওয়ার জন্য প্রশ্নকে সযত্নে নিক্ষেপ করতে হবে, যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় 'সময়' এর প্রভাবে সমস্যাটি দীর্ণ কিনা? 'সর্বোচ্চ' লাভে সমস্যাটি সময়ের প্রভাব থেকে মুক্ত। আবার 'ন্যূনতম' লাভে সমস্যাটি সময়ের প্রভাবে দীর্ণ। তাই স্পষ্ট সংকেতে শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরা হোক সমস্যা, যেখানে সময়ের প্রভাব স্বীকৃত।

এবার সমস্যাটির একটি সরলরৈখিক জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দেখে নেওয়া যাক। বস্তুটির ক্রয়মূল্যের একক মানকে একটা নির্দিষ্ট এককের সাহায্যে উভয় অক্ষ তথা X ও Y অক্ষের উপর প্রতিস্থাপিত করে যুক্ত করলে যে রেখা পাওয়া যায় তা ক্রয়মূল্যের মানসূচক রেখাকে প্রকাশ করে। যেমন ১ নং চিত্রে OA = OB ধরে প্রাপ্ত AB রেখাংশ ক্রয়মূল্যের সূচিত রেখাংশ। বিক্রয়পর্বে সময় বিবেচিত না হলে (সর্বোচ্চ লাভের ক্ষেত্রে) অনুরূপভাবে বিক্রয়মূল্যের একক মানকে ঐ নির্দিষ্ট এককের সাহায্যে উভয় অক্ষে প্রতিস্থাপিত করলে যে রেখা পাওয়া যায় তা বিক্রয়মূল্য সূচক রেখাকে প্রকাশ করে। যেমন ১ নং চিত্রে OC = OD ধারা প্রাপ্ত CD রেখাংশ বিক্রয়মূল্য সূচিত রেখাংশ। যেহেতু AB ও CD রেখাংশের প্রবণতা এক বা সমান, অতএব রেখাদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল। এই সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব হল লাভের সর্বোচ্চ পরিমাণ। অতএব লাভ MN = ON–OM.

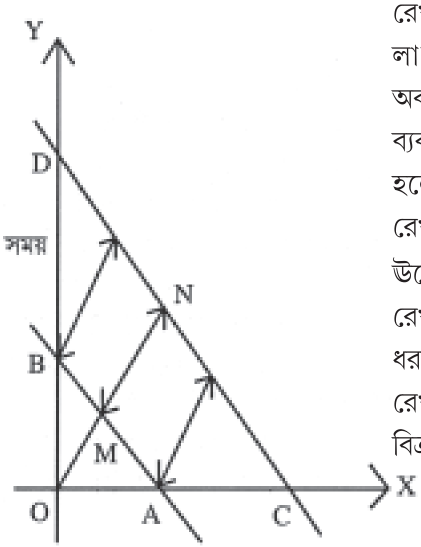

চিত্র : ১

এই লভ্যাংশটি সর্বোচ্চ। যেহেতু সময় বিবেচনাধীন নয়। এরপর দেখা যাক বিক্রয়পর্ব সময়ের প্রতি নির্ভরশীল হলে লাভের হার কিভাবে পরিবর্তিত হয়। পূর্বের মত AB রেখাংশ ক্রয়মূল্য সূচক রেখার পরিচায়ক। CD রেখাংশ বিক্রয়মূল্য সূচক রেখার পরিচায়ক। যেহেতু লাভের কথা স্বীকৃত। তাই পরিবর্তনশীল লাভের ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য সূচক রেখাকে কখনই A বিন্দুর বামপার্শ্বে স্থাপন করা সম্ভব নয়। প্রশ্নে ক্ষতির কথা উল্লেখিত থাকলে তবেই বিক্রয়মূল্য সূচক রেখার অবস্থান A বিন্দুর বামপার্শ্বে অবস্থান করবে।

∠XAB ক্রয়মূল্য সূচক রেখার আনতি। ∠XCD বিক্রয়মূল্য সূচক রেখার আনতি। ∠XAD সর্বোচ্চ লভ্যাংশ রেখার আনতি। এবার A বিন্দুকে স্থির করে AD রেখাকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরালে লভ্যাংশ সূচক রেখা সৃষ্ট আনতি কোণের পরিবর্তনের সাথে সাথে লভ্যাংশের পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এবং সময়ের সাপেক্ষে লভ্যাংশ পরিবর্তিত হতে হতে এক সময় AD রেখা AB এর উপর সমাপতিত হয়। তখন লভ্যাংশের হার শূন্য। অর্থাৎ ব্যবসাটি অলাভ জনিত সমস্যা। কিন্তু মধ্যবর্তী AE বা AF রেখা সময়ের সাপেক্ষে লাভের ক্রমাগত অবণতিকে সূচিত করে। ব্যবসায়ে লাভ রাখতে হলে বিক্রয়মূল্য সূচক রেখাংশ B বিন্দুর যত ঊর্দ্ধে উঠতে থাকবে লাভের হার তত বেশি হতে থাকবে। এবং AD রেখা AB রেখার নিকটবর্তী হতে থাকলে লাভের হার কমতে থাকবে। ধরা যাক ক্রয়মূল্য হস্তগত হওয়ার পর লভ্যাংশ যুক্ত বিক্রয়মূল্য সূচক রেখা হল AF, যা সর্বন্যূন। তখন OF = OG ধরে FG রেখাই হল বিক্রয়মূল্য সূচক রেখা। তখন লাভের অংশ হল AP [চিত্র (2)]। অর্থাৎ সামগ্রিক ঘটনাটি হল 'লাভ-ক্ষতি'তে চরম বা পরম মানের স্পর্শ।

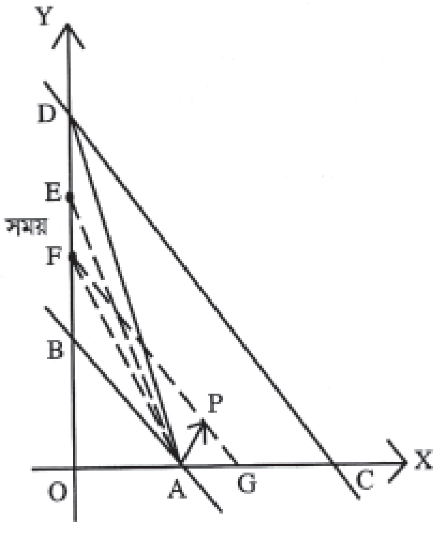

চিত্র : ২

email:monotoshkumar.mitra@gmail.com • M. 9734695094

পত্রিকা যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান

স্টুডিও ইউনিক, কাঁচরাপাড়া 9332280602 • জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ বারাকপুর M. 8017402774/9331035550 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায় , বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার , বনগাঁও M. 8637847365 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর , রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, বাদকুল্লা, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) • গৌতম শিরোমনি M. 7364874673 • শকুন্তলা মুখার্জী, বনগাঁও M. 8116480129 • সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ M. 9434570130 • বামা পুস্তকালয়, কাকদ্বীপ M. 9434570130 • অনিশ মিত্র, দুর্গাপুর, M. 9093819373 • অরিন্দম রায়, বোলপুর, M. 7001857013 • সারথী চন্দ, শিলিগুড়ি, M. 9674031082 • উত্তম দাস, আলিপুরদুয়ার, M. 9382307460 • সবুজ পৃথিবী প্রযত্নে কোডেক্স, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯ • শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, 9609844676/ 7908341942 • ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, 9635995476 • বালিঘাইনারায়ণ চন্দ্ররানা সায়েন্স ক্লাব M. 9800436364 • ষড়ানন পন্ডা এড়াল M. 6294168820

গার্গী নাগ মজুমদার

ডাইনী
সমাজ বিজ্ঞানের একটি জরুরী সমীক্ষা

বাসন্তী কিস্কু

ভালো করে দেখুন তো, পাশের ফটোর এই সাহসী কন্যাকে চিনতে পারছেন? —ঠিক ধরেছেন গত ৩০.০৫.২০১৯ তারিখে প্রায় সব প্রথম সারির দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ শিরোনামে উঠে আসা এই সাহসী মেয়েটি শান্তিনিকেতন এর রূপপুর থানার বিনোদপুর গ্রামের বাসিন্দা বাসন্তী কিস্কু। ডাইনী অপবাদে নিজের গ্রামবাসীদের হাতেই মারধর আর অশেষ লাঞ্ছনা জুটেছিল মেয়েটির। এমনকি সপরিবারে ঘরছাড়া হয়েও বহুদিন থাকতে হয়েছিল মেয়েটিকে। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও বাসন্তী কিস্কু ছাত্রীনিবাসে থেকে অদম্য মনোবলের সাথে লড়াই করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৩৯০ মার্কস পেয়ে সক্কলকে তাক লাগিয়ে দিয়ে সেদিন উঠে এসেছিল সংবাদ শিরোনামে।

ডাইনী অপবাদের তক্‌মা মাথায় নিয়েও বাসন্তী নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে—তাই তাকে অজস্র অভিনন্দন। কিন্তু সবক্ষেত্রে তা হয় কোথায়? বরং ভুরি ভুরি এমন অনেক দৃষ্টান্তই তো রয়েছে আমাদের সামনে যাঁরা আজও প্রত্যন্ত গ্রামসমাজে ডাইনী অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে বিনাদোষে মুখ বুজে দিনের পর দিন সামাজিক লাঞ্ছনা ও দুর্গতি ভোগ করে চলেছেন। কিন্তু কেন বলুন তো? এইসব ডাইনীর তক্‌মা কিভাবে, কেন লাগল তাঁদের ওপর? কোন অপরাধে এই অপবাদ—এই প্রতিকারহীন **'সামাজিক সাজা'**, এই প্রতিবাদহীন নিরুপায়তা জুটল এঁদের? আর পাঁচটা মানুষের মত সাধারণ, সুস্থ জীবনযাপনের সুযোগ পাওয়ার অধিকার কি এঁদের থাকতে নেই?

কারুর উপর 'ডাইনী' অপবাদ এইভাবে চাপিয়ে দিয়ে তাকে সর্বতোভাবে সামাজিক দিক থেকে কোনঠাসা করার এই ব্যাপারটি বহুদিন থেকে, বহুযুগ ধরে চলে আসছে। বস্তুতপক্ষে, মধ্যযুগের ইউরোপেও এই 'উইচহান্টে'র (Witchhunt) কবলে পড়ে বহু মানুষকেই অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নারী। আসলে ইউরোপের একটি অতি প্রাচীন ধর্ম ছিল প্যাগান ধর্ম। এই ধর্মমতের একটা অন্যতম বিশেষত্ব ছিল এই যে, এই ধর্মমতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করা হত। ইউরোপের এই প্যাগান ধর্মের অন্তর্ভুক্ত একটি শাখা-সম ধর্ম ছিল **'উইকান ধর্ম'**। আর এরই একটি বিশেষ দিক ছিল **'উইচক্রাফট্'** (Witchcraft)।

মধ্যযুগীয় খ্রিস্টিয় জগৎ এই উইচক্রাফটের, পরিভাষা করেছিল **'ডাকিনীবিদ্যা'**। এই উইকানদের অনেক গুহ্যজ্ঞান জানা ছিল। আংশিক তন্ত্রমন্ত্র, মূলতঃ নানারকম ভেষজ ওষুধ, টেলিপ্যাথি—এইসব বিদ্যা ও জ্ঞান প্রয়োগ করে তারা অনেকের রোগবালাই সারিয়ে তোলার চেষ্টা করত। মধ্যযুগের ইউরোপীয় খ্রিস্টান চার্চ মনে করত যে, উইকানরা এইসব গুপ্তবিদ্যা রপ্ত করেছে শয়তানের কাছ থেকে। মধ্যযুগে কুসংস্কারবশতঃ মানুষের সাধারণ শারীরিক অসুখ-বিসুখকে মনে করা হত **'ঈশ্বরের ক্রোধের কারণ'** এবং যারা এর চিকিৎসা করত–তারা ছিল **'চার্চের শত্রু'**। ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত হয়েছিল 'স্কটিশ উইচক্রাফট্ অ্যাক্ট'। এই আইনে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছিল যে, চিকিৎসার জন্য 'উইকান'দের বা 'উইচ'দের কাছে যারা যাবে—তারা সকলেই 'অপরাধী' বলে গণ্য হবে। চার্চের সিদ্ধান্তে পঞ্চদশ শতক থেকে এইসব 'উইকান'দের 'ডাইনী' অপবাদ দেওয়া হত ও প্রকাশ্যে জীবন্ত দগ্ধ করা হত। 'উইকান'দের বেশিরভাগই ছিলেন নারী, তাই এই ঘটনাকে ইতিহাসে 'Genderized mass murder' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক মার্গারেট ম্যুরে তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'The Witch Cult in Western Europe'-এ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আরও অনেক গবেষক ও সমাজ বিজ্ঞানীও এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা তাঁদের গবেষণার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস, 'জাদু'-র প্রতি বিশ্বাসের ঝোঁক, প্রতিবেশীর সাথে কোনও কারণে শত্রুতা, একাকি মহিলাকে যেন তেন প্রকারেণ কৌশলে সামাজিকভাবে কোনঠাসা করে তাঁর সম্পত্তি জবরদখল করার লোভ, তাঁর কাছ থেকে যেকোনও অজুহাতে জরিমানা বাবদ অর্থ আদায়ের চিন্তাই এসব ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বেশি করে কাজ করে থাকে। এর ভিত্তিতেই মানুষ সহজেই মনে মনে সুবিধামাফিক একজনকে এসবের জন্য দায়ী মনে করে তার ঘাড়ে সব দোষ চাপানোর চেষ্টা করে ও তাকে 'ডাইনী' বলে অভিহিত করার

ছবি : অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়

চেষ্টা করে। কখনো কখনো বা কোনও কারণে ফসলের অজন্মা হলে সেই অজন্মার দায়ও অপছন্দের ব্যক্তিবিশেষের উপর চাপানোর চেষ্টা চলতে থাকে। বলা হতে থাকে পারিপার্শ্বিক যাবতীয় 'অশুভ' ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট মানুষটির 'অশুভ' উপস্থিতি বা অস্তিত্বই দায়ী। এইভাবেই বিশেষ কাউকে চারপাশে প্রাকৃতিকভাবে, স্বাভাবিক কারণে ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া ছোট বড় সব অঘটনের জন্য দায়ী করে একঘেঁয়েমি ভরা নিস্তরঙ্গ জীবনে অন্ততঃ যেন খানিকটা হলেও চাঞ্চল্য তথা বৈচিত্র্য আনার দলগত চেষ্টাও এই ধরনের ডাইনী অপবাদ দেওয়ার প্রবণতার পিছনে পরোক্ষভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে। আবার কখনও বা কোনও মানসিক রোগী তথা স্নায়ুরোগীর তথাকথিত 'অদ্ভুত', 'খাপছাড়া' আচরণকে অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, সচেতনতার অভাবহেতু কিংবা কুসংস্কারবশতঃ ডাইনীর প্রভাবের ফল হিসাবে ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট কাউকে 'ডাইনী' অপবাদে অভিযুক্ত করার ঝোঁকও সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণায় উঠে এসেছে। আর সাধারণতঃ বিধবা অথবা বিবাহবিচ্ছিন্না কিংবা বর্ণগতভাবে প্রান্তিক সমাজের দুর্বল অংশের একাকিনী 'মহিলা'কেই 'ডাইনী' হিসাবে অভিহিত করার ঝোঁক এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর সহজ যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা এটাই যে, তাঁদের উপর সামাজিক আক্রমণ—এভাবে শানিয়ে নেওয়া তুলনায় সহজ। কারণ তাঁদের পক্ষে এর প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করা কঠিন।

গবেষকরা, সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁদের মত করে নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছেন 'ডাইনী' সংক্রান্ত এই ধ্যানধারণার মধ্যে পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা যুগযুগান্তরে সামাজিক অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস, অশিক্ষা ও কুসংস্কার-এর এই পর্দাকে উন্মোচন করতে। আসুন না আমরাও সবাই বরং আমাদের মত করে চেষ্টা করি এই ধরনের 'সামাজিক ব্যাধি' আর কুসংস্কারের অভিশাপ থেকে আমাদের সমাজটাকে বাঁচাতে। কে জানে বাসন্তী কিসকুর মতই আমার আপনার কতশত অসহায় মা-বোন প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে আজও অহরহ অকারণে সয়ে চলেছে এই 'ডাইনী' অপবাদের অপমান, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও নির্মম সামাজিক নির্যাতন।

email:gargi.nag.majumdar@gmail.com • M. 9433866811

অমর কুমার নায়ক

প্রাকৃতিক সহবস্থান

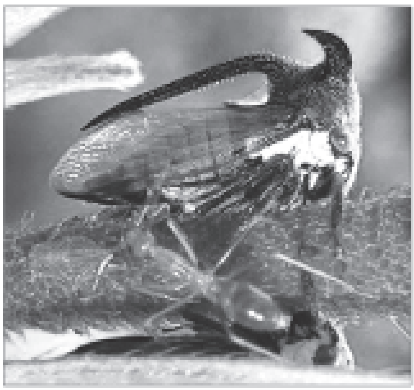

কালো পিঁপড়ে ও হরন্ড ট্রি হপার

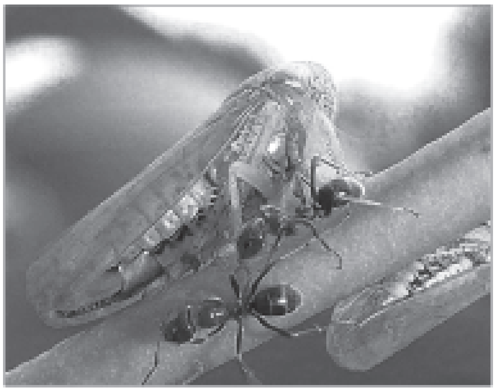

কালো পিঁপড়ে ও বাদামি প্ল্যান্ট হপার

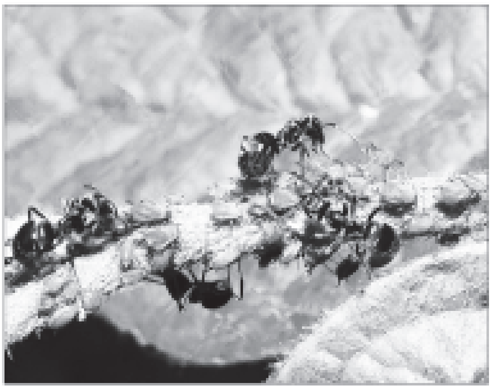

কালো পিঁপড়ে ও জাব পোকা

আমাদের চোখের সামনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার উত্তর পেয়ে একটু অবাক হতে হয়। একদিন একটি ঝোপঝাড় থেকে পোকা মাকড়ের ছবি সংগ্রহ করার সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। দুটি 'Horned Treehopper'-এর সাথে কয়েকটি কালো পিঁপড়ের দল একটি ছোটো গাছের ডালে রয়েছে আর পিঁপড়েরা কিছুতেই ট্রি-হপারগুলোর পিছু ছাড়ছে না। প্রথমে এই ঘটনাটিকে দেখে ধারণা হয়েছিল হয়তো এটা শিকারের ঘটনা। কিন্তু লক্ষ করলাম ট্রি-হপারগুলি কোন ভাবে পালানোর চেষ্টা করছে না। একই ঘটনা লক্ষ করলাম একটি প্ল্যান্ট-হপার ও কালো পিঁপড়ের মধ্যে আর জাবপোকা (Aphids) ও পিঁপড়েদের মধ্যে। তাই বেশ কয়েকবার এই ধরণের ঘটনা লক্ষ করার পর মনে প্রশ্ন জাগলো। জানার ইচ্ছেতে জানতে পারলাম এসব ঘটনাগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে এবং জীববিজ্ঞানে এই ঘটনাগুলিকে 'পারস্পরিক সহাবস্থান' নামে অভিহিত করা হয়।

বিষয়টির প্রতি আগ্রহে আরও জানতে পারলাম এই ঘটনাগুলি আমাদের প্রকৃতিতে খুব স্বাভাবিক এবং আমাদের চোখের সামনে ঘটে। ফারাক কেবল এক জায়গায় যেগুলি দেখে আমরা অভ্যস্ত সেসব বড় প্রাণীদের ক্ষেত্রে আর যে ঘটনাগুলি আমাকে আকর্ষিত করেছে সেটি ক্ষুদ্র জীবদের মধ্যে। আমরা যারা গ্রামের পরিবেশে গেছি তারা মাঠের মধ্যে গরু বা মহিষের সাথে একদল বক দেখেছি, যাদের গো-বক বলা হয়ে থাকে। এরা গরু বা মহিষের পায়ের কাছে কাছেই ঘোরে কিন্তু কোনভাবেই ভয় পায়না বা গরু-মহিষ তাড়াও করে না। ফিঙে পাখি ও

কিছু শালিক পাখিদেরও দেখেছি এদের পিঠে চেপে আরামে ঘুরে বেড়াতে আর মাঝে মাঝে পেটে, পিঠে, কানে, চোখের কোণায় বা মলদ্বারে কিছু খুঁটে খেতে। খুব বেশী হলে গরু বা মহিষ এদের লেজের আলতো আঘাত দেয় কিন্তু কোনভাবেই তাড়িয়ে দেয় না। এই সব ঘটনাগুলিই হল প্রকৃতিতে একসাথে বেঁচে থাকার ঘটনা যা প্রাকৃতিক সহাবস্থান বলে পরিচিত জীববিদ্যা আর পরিবেশবিদ্যাতে। অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট চ্যানেলেও এ ধরণের ঘটনা আমাদের পরিচিত। হাঁ করে পড়ে থাকা কুমিরের মুখ থেকে এক ধরণের প্লোভার দাঁত থেকে খুঁটে কিছু খাচ্ছে অথচ কুমিরটি নির্বিকার। আর এও দেখেছি ওয়াইল্ড ব্যাফেলো, গণ্ডারের পেটে পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল ওক্সপেকার পাখির দল। ভারতীয় জঙ্গলের তথ্য চিত্রে উঠে আসে আরেক ধরণের ছবি, যেখানে দেখি একদল ভারতীয় লেঙ্গুরের দল গাছের পাতা ফেলে দিচ্ছে বার্কিং ডিয়ারদের উদ্দেশে আর তারা পেট পুরে ভোজন করছে। পরিবর্তে হরিণের দল জঙ্গলে বাঘের আগমন জানিয়ে দিচ্ছে কর্কশ চিৎকারের মাধ্যমে। এসই সব ঘটনাগুলি প্রত্যেকটিই হল প্রকৃতিতে একসাথে বাস করার রীতির। এই একসাথে থাকার ঘটনাটিকে ইংরাজিতে বলে Symbiosis বা Symbiotic Relationship। আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে এই বিষয়ে চর্চা শুরু হয়। ১৮৭৯ সালে জার্মান ছত্রাকবিদ হেনরিক অ্যান্টন দি বেরি এই বিষয়ে যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন সেটিই গৃহীত হয়েছে 'দুটি ভিন্ন জীবের মধ্যে একত্রে বাস করাই হল সিমবায়োসিস'। পরে বিজ্ঞানীরা বলেছেন শুধু বসবাস নয় পারস্পরিক আদান প্রদান থাকাও প্রয়োজন। Symbiosis-এর বাংলা প্রতিশব্দ হল 'অন্যোন্য জীবিত্ব' যার অর্থ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে দুটি জীবের সুষ্ঠ জীবন যাপন। তবে এই ঘটনা শুধু প্রাণীদের মধ্যে নয়, উদ্ভিদ প্রাণী ব্যাকটেরিয়া প্রটোজোয়া সকলের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য দুটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে দুটি জীবনের মধ্যে একটি জীবন ঐচ্ছিক ও অন্যটি বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে বা দুটিই বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে অথবা উভয়েই ঐচ্ছিক অবস্থানে থাকতে পারে একসাথে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় লাইকেন এমন একধরণের সম্মিলিত জীব যেখানে একটি ছত্রাক ও একটি সালোকসংশ্লেষে সক্ষম জীব (Cyanobacteria) একসাথে বাস করে। এক্ষেত্রে ছত্রাকটি একাকী বেঁচে থাকতে না পারলেও সালোকসশ্লেষে সক্ষম ফটোবায়েন্ট জীবটি

বেঁচে থাকতে পারে স্বাধীনভাবে। অর্থাৎ ছত্রাকের সহাবস্থান বাধ্যতামূলক কিন্তু সায়ানোব্যাকটিরেয়াটির ঐচ্ছিক।

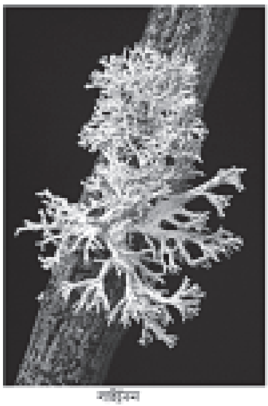
লাইকেন

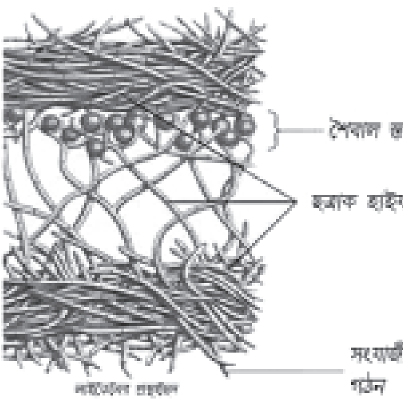

লাইকেনের প্রস্থচ্ছেদ

সিমবায়োসিসের ঘটনায় দেখা যায় অনেক সময় একটি জীবনের শরীরের মধ্যে অন্য জীবটি বাস করে থাকে একে 'এন্ডোসিমবায়োসিস' বলে; এর উদাহরণ হল উদ্ভিদের মূলের মধ্যে নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি। আবার অনেক সময় একটি জীবের শরীরের উপরিভাগে অন্য জীবটি থাকে একে 'এক্টোসিমবায়োসিস' বলে; এর

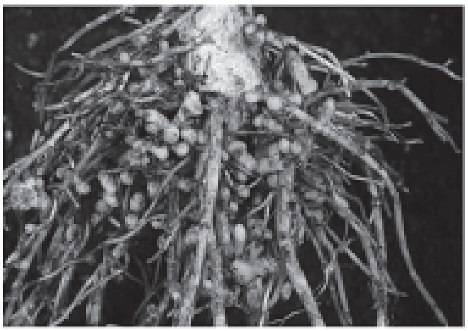
শিম্বজাতিয় উদ্ভিদের মূলে গোলাকার অর্বুদগুলি

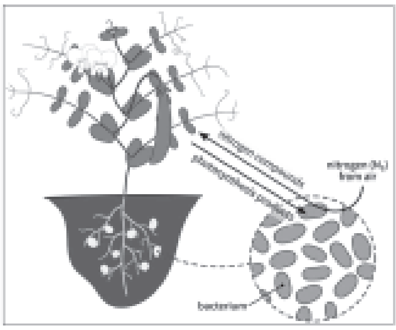
মিথোজীবী পদ্ধতি

উদাহরণ হল মাথার উপর থাকা উকুন। অবশ্য প্রথমটিতে দুজনেই উপকৃত হলেও দ্বিতীয় ঘটনায় মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় আর উকুন পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়।

অবশ্য ক্লিনারফিস প্রজাতির এক ধরনের মাছ আশ্রয় দাতার পিঠের উপর থাকে এবং মরা চামড়া খেয়ে ফেলে, এতে উভয়েই উপকৃত হয়। Symbiotic Relationship মূলত তিন ধরনের হয়— Mutualistic relationship (পারস্পরিক মঙ্গলজনক সহাবস্থান), Commensalistic relationship (সহভোজী সম্পর্ক, এক্ষেত্রে একজন সুবিধা পায় কিন্তু অন্যজন ক্ষতিগ্রস্থ হয় না আবার সুবিধাও পায় না), Parasitisic relationship (পরাশ্রয়ী সম্পর্ক, এক্ষেত্রে আশ্রয়দাতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়)। এই তিনটি ধরণ ছাড়াও আরও কয়েকটি সম্পর্ক রয়েছে সিমবায়োসিসের যেমন— Amensalism, Cleaning symbiosis এবং Mimicry ; যদিও অনেকেই মনে করেন এগুলি আসলে মূল তিনটি সম্পর্কেরই ভিন্ন রূপ মাত্র।

পারস্পরিক মঙ্গলজনক সহাবস্থান বা Mutualistic relationship সম্পর্কে নাম থেকেই বোঝা যায় যে দুটি ভিন্ন জীবের সহাবস্থানে উভয়েই উপকৃত হয়। এক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলক এবং ঐচ্ছিক সহাবস্থান নির্বাচনের সম্পূর্ণ ভার জীবের নিজের। প্রাণীজ খাবারের তুলনায় উদ্ভিজ খাদ্যের হজম অপেক্ষাকৃত জটিল আর তাই এই ধরণের ঘাস এবং উদ্ভিজ খাদ্য পরিপাক করতে উদ্ভিদভোজীদের অন্ত্রে সেলুলোজ জাতীয় খাদ্য হজমকারী বিশেষ প্রটোজোয়া বা ব্যাকটেরিয়া থাকে। এতে উভয়েই লাভবান হয়। সামুদ্রিক প্রবালের মধ্যে অনেক ধরণের শৈবাল জাতীয় জীবের উপস্থিতি থেকে জানা গেছে উভয়ের অবস্থান একে অপরের মঙ্গল সাধন করে আসছে। সামুদ্রিক Clowfish-দের শরীরে চামড়ায় বিশেষ আচ্ছাদন কাঁটা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। এক্ষেত্রেও উভয়ে উপকৃত হয়। কারণ Sea Anemones-দের খায় এমন মাছদের হাত থেকে বাঁচায় Clownfish মাছ। পরিবর্তে শিকারি জীবদের হাত থেকে Sea Anemones, Clownfish-কে বাঁচায়। আরেক ধরণের সামুদ্রিক প্রাণী Goby fish, এরা চিংড়িদের সাথে একসঙ্গে বাস করে। চিংড়িরা প্রায় অন্ধ তাই বিপদ বুঝলে গোবি মাছ চিংড়িদের ইঙ্গিত দেয় এবং পরিবর্তে চিংড়ির খোঁড়া গর্তে গোবি মাছকে থাকতে দিয়ে তাকেও রক্ষা করে। এবার আসি যে ঘটনা আমাকে এই বিষয় নিয়ে ভাবিয়েছে সেই বিষয়টি তুলে ধরতে পিঁপড়েদের দলকে প্রায় সময় অ্যাফিড, প্ল্যান্ট-হপার, লিফ-হপার, ট্রি-হপারদের সাথে থাকতে দেখা যায়। আসলে এই সময় পিঁপড়েরা এদের থেকে এক ধরণের মধু জাতীয় পদার্থ পায় যার বিনিময়ে পিঁপড়েরা এদের রক্ষা প্রদান করে। এধরনের আরও অনেক ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যায় পারস্পরিক মঙ্গলজনক সহাবস্থানের। এ ধরণের ঘটনা কিছু প্রজাপতির লার্ভা ও পিঁপড়েদের মধ্যেও দেখা যায়।

Commensalistic relationship এর ক্ষেত্রে একজন সুবিধা পায় কিন্তু অন্যজন যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় না তেমন আবার সুবিধাও পায় না। সাধারণত একটি জীব অন্য জীবরে উপর চেপে ঘুরে বেড়ায় বা তার সাথে থাকে তার ঘরে কিন্তু অশ্রয়দাতাকে কোনভাবে কোন সাহায্য করে না আবার ক্ষতিও করে না। যেমন মৃত শামুকের খোলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কাঁকড়া বা গাছের ডালে বানানো বাসায় থাকা মাকড়সা শামুকের বা গাছের কোন উপকার করে না আবার ক্ষতিও না। এছাড়াও কয়েকটি উদাহরণ আছে এই সম্পর্কটি বোঝাতে যেমন —Remora নামের একধরনের সামুদ্রিক মাছ হাঙরের সাথে থাকে ঝাঁকে এবং হাঙরের

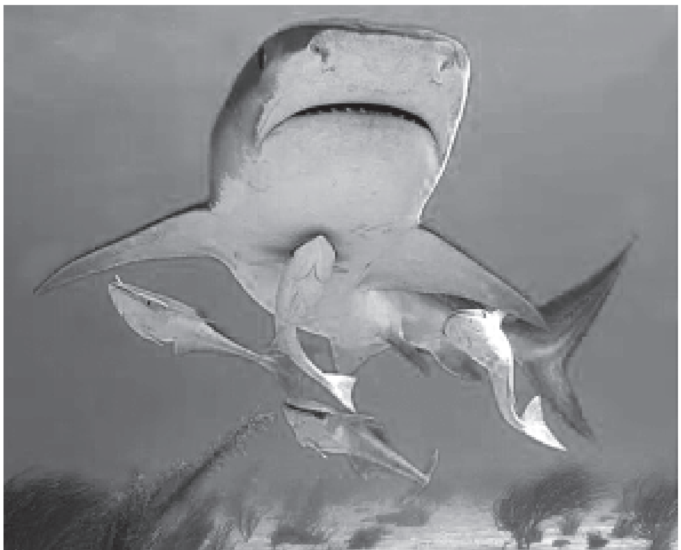
রিমোরা মাছের হাঙরের সাথে সহবস্থান

মল খেয়ে জীবন নির্বাহ করে, এছাড়া Pilotfish নামে আরেক ধরনের সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায় যারা হাঙর, স্টিং-রে এবং সামুদ্রিক কচ্ছপের সাথে থাকে। এতে এরা তিনটি উপায়ে উপকৃত হয় ১) খাবার ২) বাসস্থান ৩) সুরক্ষা। এক্ষেত্রে হাঙর বা অন্য আশ্রয়দাতা প্রজাতির কোন ক্ষতি বা উপকার হয় না। অনেক সময় গবাদি পশুর খাটালের কাছেও দেখা যায় প্রচুর পাখির বাসা যারা ওদের দ্বারা উপকৃত হয় মল ও ফেলে দেওয়া খাবার খেয়ে। এসবই এধরনের সম্পর্কের দৃষ্টান্ত।

Parasitisic relationship বা পরাশ্রয়ী সম্পর্কে পরাশ্রয়ী জীবটি সর্বতোভাবে উপকৃত হলেও অন্য জীবটির ক্ষতি সাধন করে। যেমন ফিতাকৃমি, মশা, উকুনের রক্তচোষা প্রভৃতি ছাড়াও অজস্র উদাহরণ আছে পরাশ্রয়ী সম্পর্কের। উইভিল জাতীয় পোকারা গাছের কাণ্ডে, ফলে, বীজে ডিম পাড়ে এবং লার্ভা থেকে পূর্ণাঙ্গ দশা পর্যন্ত আশ্রয় দাতার শরীর থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে তাদের ক্ষতি করে নিজের উপকার করে।

অনুকরণ (Mimicry) আরেক ধরনের সিববোয়োটিক সম্পর্ক। যেখানে দুটি সম্ভাব্য ফল পাওয়া যায়। প্রথম (Batesian mimicry) ধরণটিতে যে নকল করছে সে উপকৃত হয় কিন্তু বাকীরা লাভবান হয় না। যেমন হভারফ্লাই নামের পতঙ্গটি হলদে কালো রঙের সুযোগে কুমোরে পোকার (Potter wasp) নকল করে পতঙ্গভুক পাখিদের ফাঁকি দেয়। এক্ষেত্রে হভারফ্লাই লাভবান হলেও বাকিরা বঞ্চিত হয়। আবার অন্য ধরনের (Mullerian mimicry) অনুকরনের পদ্ধতিতে উভয়েই উপকৃত হয়। এই ঘটনা দেখা যায় মনার্ক জাতীয় প্রজাপতি, কোরাল সাপ, বিষাক্ত রঙিন ব্যাঙ বাম্বেল প্রভৃতি প্রাণীর মধ্যে যারা রঙের ধন্দে শিকারিকে বোকা বানায়। যেমন জেব্রাদের গায়ের দাগের ধরন শিকারিকে বিভ্রান্ত করে শিকার নির্বাচনে। কিংবা নির্বিষ সাপ বিষাক্ত সাপের মত

ফোঁস ফোঁস করে বা ফণার মত শরীর ফুলিয়ে ভয় দেখায়। এসবের মধ্যে দিয়ে যে নকল করছে সে যেমন রক্ষা পায় তেমনি যার নকল করছে তার প্রচার করে পরোক্ষভাবে তারও উপকার করে।

Amensalism এমন এক ধরণের সিমবায়োটিক সম্পর্ক যেখানে একটি প্রজাতি অন্য প্রজাতিকে ক্ষতি করে এমনকি মেরে ফেলে নিজের উপকার করে। Black walnut নামের এক প্রকার গাছ আমেরিকায় পাওয়া যায় যারা একটি বিশেষ রাসায়নিক উপাদান নিঃসরণ করে যার প্রভাবে আশেপাশের গাছেরা মারা যায়। এর আর একটি সহজ উদাহরণ যে কোনো খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক।

Cleaning symbiosis সম্পর্কে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ সামুদ্রিক মাছ Cleaner fish অন্য বড় মাছ বা সামুদ্রিক প্রাণীর শরীর পরিষ্কার করে থাকে।

যদিও Mimicry-কে Mutualistic আর Commensalistic relationship এর দুটির একটি Amensalism-কে Parasitisic, আর Cleaning Symbiosis-কে Mutualistic relationship-এর ভিন্ন রূপ হিসাবে মনে করা হয় তবুও এই বিষয়ে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেন।

পারস্পরিক সহাবস্থানকে অনেক জীববিজ্ঞানীই বিবর্তনের জন্য দায়ী একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ধরছেন। আসলে পারস্পরিক সহাবস্থান দুটি জীবের মধ্যে থাকা দীর্ঘদিন যাবৎ জৈবিক পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক। তাই বিবর্তনে এর গুরুত্ব থাকা অবাক হওয়ার মতো নয়। শুধু মাত্র পারস্পরিক প্রতিযোগিতা নয় জীব বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি হল সহযোগিতা, মিথষ্ক্রিয়া, সহাবস্থান এবং নেটওয়ার্কিং। পরাগযোগ (Polination)-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে মনে করা হয় সহ বিবর্তনের। ডুমুর গাছে ফুল দেখেনি কেউই আসলে ডুমুরের ফুলের বিভিন্ন অংশ ফলের মধ্যে থাকে। তাই পরাগযোগের অন্য নিয়ম। ডুমুর ফলে এক ধরনের ওয়াস্প প্রজাতি ডিম পাড়ে এবং লার্ভা দশায় ফল মধ্যে থেকে পুষ্টি পায় আর বড় হয়ে ফল ফেটে বেরিয়ে এসে পরাগযোগ ঘটায় অন্য ডুমুর ফলের ভেতর ডিম পাড়ার সময়। অবশ্য মা ওয়াস্প ডুমুর ফলের মধ্যে থেকে বেরতে পারে না কোনদিন। বিভিন্ন পাখি, পতঙ্গ ও বাদুরের প্রজাতি পরাগযোগে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এক ধরনের পিঁপড়ের প্রজাতি (Acacia ant) যারা এক ধরনের গাছে বাসা করে থাকে এবং ঐ গাছ থেকে পুষ্টি ও আশ্রয় পায় পরিবর্তে অন্য ক্ষতিকর পতঙ্গ এবং গাছের থেকে ঐ বিশেষ প্রজাতির গাছকে রক্ষা করে। এইসব ঘটনা পারস্পরিক সহাবস্থানের সম্পর্ককে (Mutualistic relationship) নির্দেশ করে। অর্থাৎ পারস্পরিক সহাবস্থান না থাকলে বিবর্তনের জয়রথ কবেই থেমে যেত।

সুতরাং এই প্রাকৃতিক সহাবস্থান বিষয়টি প্রতিটি জীবের মধ্যে ছড়িয়ে আছে এবং আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের সাথে বেঁধে রেখেছে এক সুতোয়। একটি ছোট্ট ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা কত বড় প্রাকৃতিক ঘটনার সম্পর্কে জানলাম। এর থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার একটি জীবের সাথে অন্য জীবের ভবিষ্যৎ এমন এক সুতোয় বাঁধা যে প্রতিটি জীবের সমান গুরুত্ব আছে আমাদের বাস্তুতন্ত্রে। তাই একটির অস্তিত্ব বিপদগ্রস্ত হলে কেউ রেহাই পাবে না প্রকৃতির রোষানল থেকে। আমাদের পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সবার অস্থিত্ব রক্ষার মাধ্যমে তবে সবার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে।

email:amarnayk.stat@gmail.com • M. 8001467741

তন্ময় ধর

বৈদুর্য্য নীহারিকা (Cat's eye nebula)

উত্তর আকাশে গোধিকামণ্ডলের (Constellation Draco) গভীরে প্রায় ৩০০০ আলোকবর্ষ দূরে থাকা এই নীহারিকাটিকে ঘিরে অনেক রহস্য রয়েছে। এখনো পর্যন্ত জানা নীহারিকাদের মধ্যে এটির গঠন সবচেয়ে জটিল। মূলত হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম দিয়ে তৈরি। একে নিয়ে প্রশ্ন অনেক। প্রথমত, এই নীহারিকার বাইরের দিকের বহুবর্ণী গ্যাসস্তরগুলির জটিল গঠন ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, নীহারিকার কেন্দ্রীয় অংশে যুগল তারকা থাকা উচিত। অথচ, কেন্দ্রে একটিই তারা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রহসদৃশ নীহারিকার বিভিন্ন অংশের রাসায়নিক উপাদান যা হওয়া উচিত এতে তা নেই। তৃতীয়ত, বহির্মুখী গ্যাসীয় স্তরগুলি সনাতন গতিবিদ্যার কোন সরল নিয়ম মেনে কেন্দ্রীয় তারকা থেকে নির্গত হয়নি।

নীহারিকাটির অবস্থান কিন্তু বেশ আকর্ষণীয় জায়গায়। আকাশে সূর্যের আপাত গতিপথকে (Ecliptic) বিষুবরেখা ধরে আকাশের দুই গোলার্ধ ভাগ করলে উত্তর আকাশের মেরুবিন্দুতে (North Ecliptic Pole) থাকবে বৈদুর্য্য নীহারিকা। এই কারণে নীহারিকাটি বহুচর্চিত। হাবল স্পেস টেলিস্কোপ এবং চন্দ্র এক্স-রশ্মি পর্যবেক্ষক বৈদুর্য্যের অন্দরমহলে জোরালো অনুসন্ধান চালিয়েছে। দেখা গেছে, নীহারিকার কেন্দ্রীয় অংশে প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ৫০০০ বস্তুকণা রয়েছে এবং তাপমাত্রা মোটামুটি ৭০০০-৯০০০ কেলভিন। নীহারিকার বাইরের দিকে কিন্তু তাপমাত্রা অনেকটাই বেড়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ১৫০০০ কেলভিনে। ঘনত্ব কমে যাচ্ছে অনেক। নীহারিকাটির বাইরের দিকে কিন্তু তাপমাত্রা অনেকটাই বেড়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ১৫০০০ কেলভিন। ঘনত্ব কমে যাচ্ছে অনেক। নীহারিকাটির কেন্দ্রে একটি অত্যুজ্জ্বল উলফ-রায়েট শ্রেণীর তারকা রয়েছে। সূর্যের চেয়ে ১০০০০ গুণ উজ্জ্বল এই তারাটির পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রা প্রায় ৮০০০০ কেলভিন। ক্ষ্যাপা এই তারাটি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টন পরিমাণ জ্বলন্ত গ্যাস বাইরে নিক্ষেপ করছে। ফলে তারকাটির আবহমণ্ডলের নাক্ষত্রিক বাতাসের বেগ অবিশ্বাস্য, প্রায় ১৯০০ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড।

২০০১ সালে চন্দ্র এক্স-রশ্মি টেলিস্কোপের পর্যবেক্ষণ এক নতুন বিতর্ক উসকে দেয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কেন্দ্রীয় কিছু অংশের তাপমাত্রা প্রায় ১৭ লক্ষ কেলভিন। এবং আরো রহস্যময় যে ব্যাপারটি ধরা পড়ে তা হল, কেন্দ্রের একটি বিন্দু-উৎস থেকে প্রায় ৫০০-১০০০ ইলেকট্রন ভোল্টের এক্স-রশ্মি নিঃসরণ হচ্ছে। কেন্দ্রের তারকাটি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ওর পৃষ্ঠতাপ ১ লক্ষ কেলভিন হলেও অত শক্তিমাত্রার এক্স-রশ্মি নিঃসরণ ওর পক্ষে সম্ভবপর নয়।

email:tstorm.tanmay@gmail.com • M. 9892359674

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

জানো কি?

কোন পাখি তার নিজের ওজনের তুলনায় বেশি ওজনের ডিম পাড়ে?

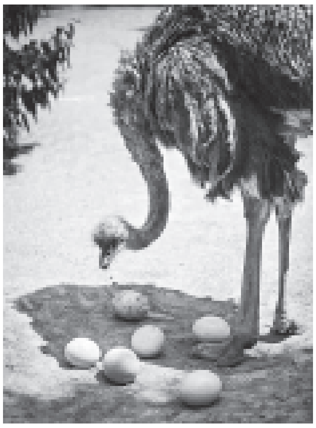

বড় আকারের পাখিদের মধ্যে অস্ট্রিচ (Ostrich) অন্যতম। এদের ডিমও পেল্লায় বড়। স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় এদের ডিমের ওজন যে কোনো পাখির ডিমের ওজনের তুলনায় বেশি। একথা ঠিক। তবে পাখিটির নিজের ওজনের সঙ্গে তার ডিমের ওজন তুলনা করলে একটি ছোট্ট পাখির কাছে হেরে যাবে। একটি মেয়ে অস্ট্রিচ ওজন সাধারণত ১৪০ কিলোগ্রাম-এর মত হয়। আর পাখিটির ডিমের ওজন হয় ১.৪ কিলোগ্রাম-এর মত। শতকরা হিসাবে ডিমের ওজন পাখিটির নিজের ওজনের মাত্র ১ শতাংশ। নিউজিল্যান্ডের কিউই (Kiwi) পাখি আকারে মুরগির মত। অস্ট্রিচ পাখির সঙ্গে ওজনের কোনো তুলনাই চলে না। একটি মেয়ে কিউই-র ওজন সাধারণত ১.৮ কিলোগ্রাম-এর মত হয়ে থাকে। এরা যে ডিম পাড়ে তার গড় ওজন ০.৪৫০ কিলোগ্রাম। শতকরা হিসাবে পাখিটির ওজনের সঙ্গে ডিমের ওজন দাঁড়ায় ২৫ শতাংশ। অতএব বলা যায় পাখির নিজের ওজনের সঙ্গে তার ডিমের তুলনামূলক হিসাব করলে ছোট্ট কিউই বিশাল অস্ট্রিচকে বোল্ড আউট করে দেবে।

email:kbb.scwriter@gmail.com
• M. 9433145112

পরিবেশ ডট কম

পরিবেশ ডট কম
পরিবেশ ও বিজ্ঞান

বাংলা ভাষায় পরিবেশ ও বিজ্ঞানের একমাত্র চ্যানেল ও পোর্টাল

Mobile - 9051222813
Email - poribesnews@gmail.com
Website - www.poribes.com

জগন্ময় মজুমদার

আপেক্ষিক সময়ের কবিতা

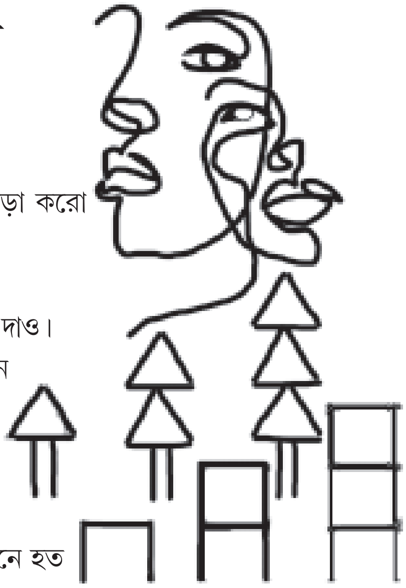

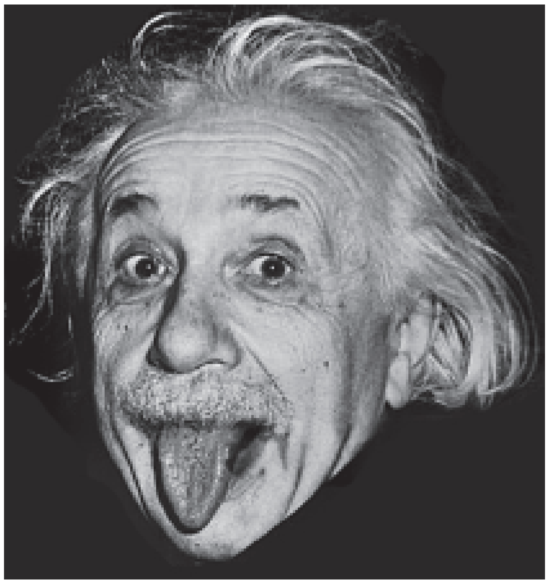

সরলরেখা

তাকে তুমি না ছুঁয়ে না কেটে ছোটো কিংবা বড়ো করো
তুমি হতে পারোনি অতটা সরোগড়ো
তাহলে দাঁড়াও
তার পাশে আরো এক সমান্তরাল রেখা এঁকে দাও।
কারুকে ছোটো বা বড়ো করবে কিংবা অপমান
লাগে না গায়ের জোর অথবা মুখের বান।

তাঁর ফটো

যখন ছাত্র ছিলাম মাস্টার মশাইকে কত দূরের মনে হত
৪০ বছর পর
তাঁর ফটো দেখে মনে হয় তিনি বোধহয় আমারও ছোটো
ওইতো প্যান্টের বেল্টে আটকানো যাচ্ছে না বাড়তি মেদ
মনে নেই কোনো খেদ দিব্যি হাসছেন।

জন্মমৃত্যু

যত ভিতরে আছে, বাইরে দাঁড়িয়ে ঢের বেশি জন।
দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একজন অসুস্থ হয়ে যান।
ভিতরে তখন কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়
একজন আসন্নপ্রসবা।
কার বেশি প্রয়োজন শুশ্রূষা?

জন্ম আটকে থাকে না, মৃত্যুও রোধ করা যায়।

অমর ঘোষ

পৃথিবী

কার্নিসে খেলছিল পুরোনো বালবের মতো হলুদ
রোদ
পিংকিদের নারকেল গাছের পিছনে সূর্য অস্ত
গেল

ফিরে এল শামুকখোলের দল

সূর্য নয়
পৃথিবীই ফিরে আসে নিভৃত আশ্রয়ে...

শিবপ্রসাদ পাল

আমফান অনুভবে

লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে
শক্তি বাড়াচ্ছিল হাওয়ার ঘূর্ণন সমুদ্রের
উপর

অবশেষে তার নিম্নভাগ
ছুঁলো শঙ্কিত সবুজ প্রান্তর

ঝড়, এল আকাশ থেকে
তার তীব্র গতি
কাঁপন ধরল বনস্পতির শিকড়ে
গাছের শাখা, শিবের জটার মতো
আন্দোলিত হতে থাকল

উড়ে গেল ঘরের চাল, কত কি
সতীর খণ্ডিত দেহাংশ যেন

বৃষ্টি নেমে এল জলপ্রপাতের মতো
ঝড়, গোঁ গোঁ শব্দে বেদনা জানাতে থাকল

রাতজাগা পাখি ডানার ভারসাম্য হারাল

গাঢ় অন্ধকার চিরে
জোনাকির আলো জ্বলছিল
হঠাৎ হঠাৎ।

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

ধস

প্রজাপতিটি উড়ছিল...
উড়তে উড়তে পাখিটি ডাল খুঁজছিল...

পাহাড়টি সমতলের দিকে
তাকিয়ে থাকতে থাকতে
একদিন হঠাৎ নীচে নেমে এল।

মানুষের জটলার মাঝখানে
পড়েছিল একটা প্রজাপতি,
একটা পাখি
এবং...

এবং কতগুলো বাড়ি...
সবাই অনস্তিত্বের মধ্য দিয়ে
জানান দিচ্ছিল অস্তিত্বের।

হাওয়া একই রকম বয়ে যাচ্ছিল
শিস দিতে দিতে।
সূর্যটা একই রকম তাকিয়ে ছিল
তার গ্রহগুলোর দিকে।

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

ক্ষমা করো, ক্ষমা

আবারও বাঁচিয়ে দিলে হেতাল ও সুন্দরী গরান
বীর সেনাপতি যোদ্ধা বারবার যুদ্ধে প্রাণ দেয়,
সৈনাপত্য কাঁধে তুলে নেয় যে তখনই অন্য কেউ—
প্রতিরোধ ভাঙতে পারেনি আইলার সমুদ্র-ঢেউ।
কৃতঘ্ন আমরা তারই শিকড়ে দি করাতের টান!

খোঁজ নি, হিসেব কষি এ-চরবাসীর নষ্ট প্রাণ
কত ধ্বস্ত ঘর, নষ্ট শস্য, বিনষ্টি বিদ্যুৎ খুঁটির,
ভগ্ন উরু, ছিন্ন শির, ভূলুণ্ঠিত বৃক্ষ-পরিবার
উড়ন্ত পাখির চোখে দেখে নির্বিকার হেঁটে যাই—
কিভাবে যে দেয়া যাবে মানুষের সু-পুনর্বাসন!

রণক্ষেত্রে সৈন্য মরে—নিয়ে যায় শববাহী গাড়ি
ভাবি, পরিবার-কথা, জানাই সশ্রদ্ধ সম্মান
দুহাত বাড়িয়ে ঝড় আটকায় বৃক্ষ আজীবন—
করাতির কাছে করি দেহখন্ড প্রত্যহ নিলাম।

নির্লজ্জ মানুষ আমি, করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনায়।

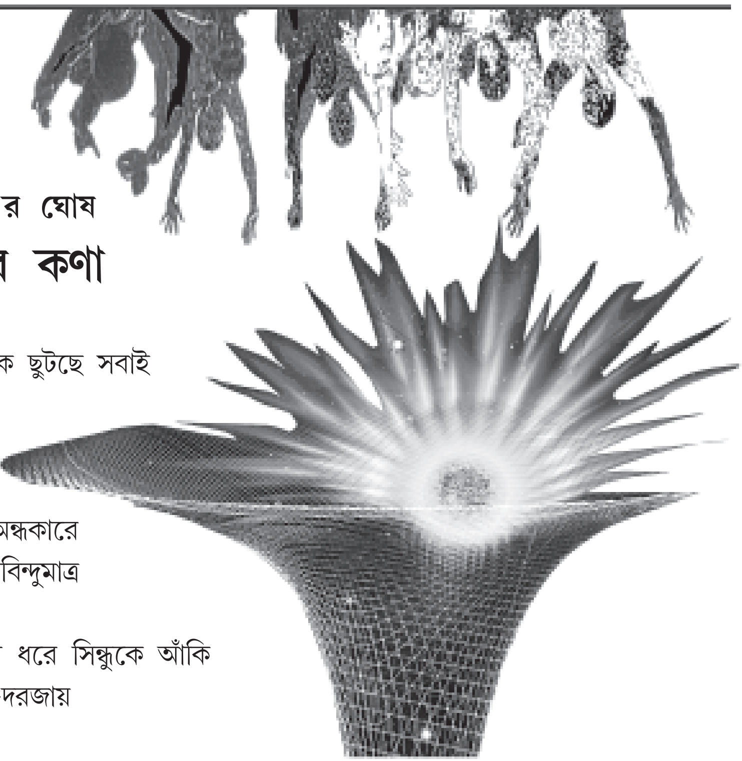

চন্দ্রশেখর ঘোষ

আলোর কণা

আলোর দিকে ছুটছে সবাই
আমিও

অথচ
এই অনন্ত অন্ধকারে
আলো এক বিন্দুমাত্র

ঐ বিন্দু ধরে ধরে সিন্ধুকে আঁকি
তোমার ঘুম-দরজায়

আলো জানে...

জ্যোতিষের শূন্যগর্ভতা ৪

গৌ ত ম ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতার দৃষ্টান্ত

১. ১৯০৪ সালে ২০০ শিখসেনা সহ তিব্বত অভিযান করে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী। লামাদের সেনারা পুরনো ঢাল তলোয়ার নিয়েই যুদ্ধে নামে। লামারা ঐ সৈন্যদের গলায় মন্ত্রঃপূত তাবিজ ঝুলিয়ে দেয়।

তিব্বতী সেনা

বলে তাবিজের প্রভাবে কোনো গুলি শরীরে প্রবেশ করবে না। শয়ে শয়ে লামাসৈন্য মেসিনগানের গুলিতে মারা যায়।

২. অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারকে দুজন গণক বলেছিলেন তাঁর আয়ু ৩২ বছর। ভলতেয়ার বেঁচেছিলেন ৮৪ বছর।

৩. ১৫৫৫ সালে এক ইংরেজ গণক বলেছিলেন কিশোর রাজা ষষ্ঠ এডোয়ার্ড ৫ বছর বয়সের পর রোগে আক্রান্ত হলেও অনেক বছর বাঁচবেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

৪. ১৯৭৯ সালে ৭ অক্টোবর জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রয়াত হন ৭৭ বছর বয়সে। ঐ বছরই (১৯৭৯) ৮ এপ্রিল পাটনায় ভারতবিখ্যাত জ্যোতিষী গণেশকান্ত ঝা ঘোষণা করেন—জয়প্রকাশ ৯৩ বছর বাঁচবেন।

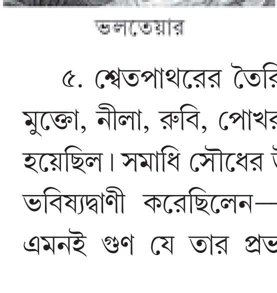

ভলতেয়ার

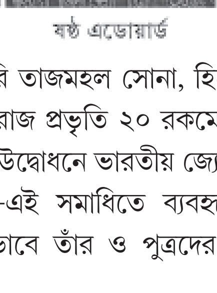

ষষ্ঠ এডোয়ার্ড

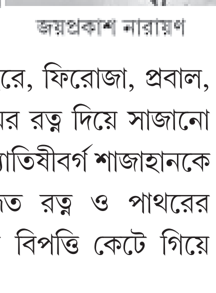

জয়প্রকাশ নারায়ণ

৫. শ্বেতপাথরের তৈরি তাজমহল সোনা, হিরে, ফিরোজা, প্রবাল, মুক্তো, নীলা, রুবি, পোখরাজ প্রভৃতি ২০ রকমের রত্ন দিয়ে সাজানো হয়েছিল। সমাধি সৌধের উদ্বোধনে ভারতীয় জ্যোতিষীবর্গ শাজাহানকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—এই সমাধিতে ব্যবহৃত রত্ন ও পাথরের এমনই গুণ যে তার প্রভাবে তাঁর ও পুত্রদের বিপত্তি কেটে গিয়ে চিরসুখী হবেন। অথচ পরিহাস এই—শাজাহান জীবদ্দশাতেই অসুস্থ অবস্থায় পুত্র আওরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হন। প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকোকে আওরঙ্গজেব বন্দী ও হত্যা করে তার ছিন্নমুন্ড কাপড়ে ঢেকে শাজাহানকে উপহার পাঠান। শাজাহানের আর দুই পুত্র মুরাদ ও সুজাকেও হত্যা করা হয়। আট বছর জেলে অপরিসীম দুঃখযন্ত্রণার জীবন কাটিয়ে জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আওরঙ্গজেব

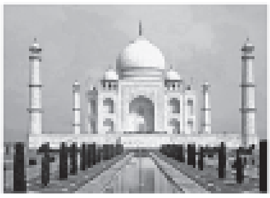

তাজমহল

শাহ সুজা

মুরাদ বকস

৬. এছাড়া পৃথিবী ধ্বংস হবার ভবিষ্যদ্বাণী করা বহু জ্যোতিষী বহুবার অপদস্থ হয়েছেন। ১৯৬২-তে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মকর রাশিতে অষ্টগ্রহের সমাবেশ ঘটেছিল। জ্যোতিষীরা বলেছিলেন—এবছরই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আজ ২০২১ সালে আপনি এখন ঘরে বসে 'বিজ্ঞান অন্বেষক' পত্রিকা পড়ছেন।

রাশিফল যখন হাসির খোরাক

দৈনিক সংবাদপত্রগুলোয় রোজকার 'রাশিফল', আজকের দিন কেমন যাবে' তার একটা তালিকা প্রতিদিনই প্রকাশ পায়। যার সাথে প্রকাশ পায় আমাদের পাঠককুলের নির্বুদ্ধিতা আর সংবাদপত্রের চতুরতা। গত ৭, ৮ ও ৯ নভেম্বর ২০১৭ তিনটি দৈনিকের রাশিফলের তুলনা দেখা যাক—

তারিখ	রাশি	আনন্দবাজার	এই সময়	বর্তমান
৭ই নভে:	বৃশ্চিক	কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি। প্ররোচনা উপেক্ষা করতে না পারলে নিজের ক্ষতি।	প্রেমের জন্য ভাল দিন। পরিবারের শান্তি, বেকার-দের চাকরি। শরীর স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে।	নৈরাশ্য
	মীন	সহকর্মীরা ক্ষতি করতে পারে। একাধিক পথে বাড়িতে উপার্জন।	বেকারদের সুখবর। ঘরে শান্তি। প্রেম বাধা নেই।	কষ্টপ্রদ
৮ই নভে:	মিথুন	বিষয় সম্পত্তি জনিত ভাই বোনের সাথে সম্পর্ক হানি। অতিরিক্ত উদ্বেগে স্বাস্থ্যের ক্ষতি।	ভাল দিন, কর্মস্থলে ভাল খবর। প্রেমে কোনো বাধা নেই। উচ্চশিক্ষায় বাধা কেটে যাবে।	প্রাপ্তি
	বৃশ্চিক	স্বজন মহলে জনপ্রিয়তা বাড়বে। ললিত কলায় উপার্জন বৃদ্ধি। দীর্ঘদিনের বকেয়া আদায়।	দিনটা খুবই খারাপ। সব কাজে সতর্ক থাকুন।	প্রতিকূল
৯ই নভে:	মকর	কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। শত্রুপক্ষ দুর্বল হয়ে পড়বে।	ব্যবসায় ক্ষতি। পাওনা টাকা আদায় হবে না। ব্যবসায় লগ্নি বাড়াবেন না শত্রুদের এড়িয়ে চলুন।	অনুকূল

এবারে তুলনা করুন ৭ নভে: বৃশ্চিক ও মীনে এই সময়/বর্তমান, ৮ নভে: মিথুন ও বৃশ্চিকে আনন্দবাজার/এই সময় আর ৯ নভে: মকরে আনন্দবাজার/এই সময়। এরপরও কি 'রাশিফল' দেখবেন?

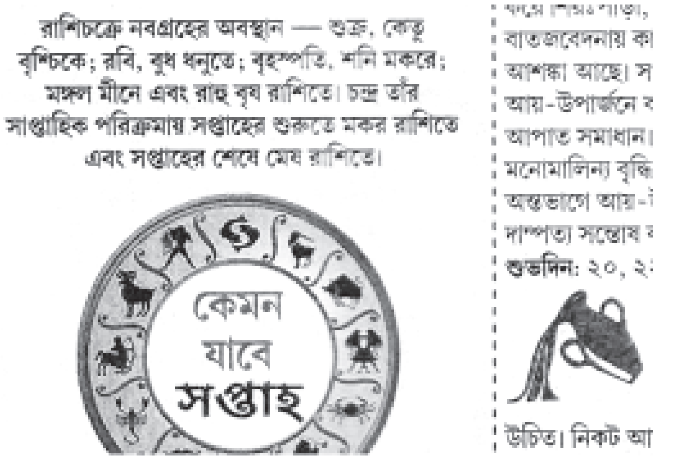

রত্ন, পাথর, মেটালের প্রভাব

আধুনিক রসায়নবিদ্যা অনুযায়ী গ্রহরত্ন হল ভূত্বকে প্রাপ্ত কিছু খনিজ পদার্থ ছাড়া কিছু নয়। খনিজের বিশেষ কেলাসিত অবস্থা রত্নকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। নইলে সে নুড়ি ছাড়া কিছু নয়। রত্ন হবার অন্যতম শর্ত তার কাঠিন্য। চুনী হল কোরান্ডাম (অ্যালুমিনিয়ামের যৌগ), নীলা-অ্যালুমিনা, পান্না-বেরিল (বেরিলিয়াম, অ্যালুমিনিয়ামের যৌগ), প্রবাল বা পলা-ক্যালসাইট (ক্যালসিয়াম কার্বনেট), গোমেদ-গারনেট ইত্যাদি।

রত্নের বর্ণ মূলত ত্বকের বা অভ্যন্তরস্থ অশুদ্ধির জন্য। তাই বিশুদ্ধ রত্ন সকলেই বর্ণহীন। অশুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমানের উপর নির্ভর করে বর্ণ। রত্ন বর্ণযুক্ত, কারণ অশুদ্ধিহীন রত্ন আসলে বিরল। যেমন একই অ্যালুমিনিয়ামের যৌগ চুনী (রুবি) লাল এবং নীলা নীল রঙের, অশুদ্ধির পার্থক্যের জন্য। অথচ জ্যোতিষীরা রবির সমস্যায় চুনী এবং শনির জন্য নীলা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। চুনীর লাল রঙ এবং পান্নার সবুজ রঙ একই অশুদ্ধি ক্রোমিয়াম অক্সাইডের পরিমাণের পার্থক্যের জন্য। মুক্তো ও প্রবাল দুটিই ক্যালসিয়াম কার্বনেটের বিশেষ রূপ। অথচ জ্যোতিষীরা বৃহস্পতি বিরুদ্ধে হলে মুক্তো ও মঙ্গল দুর্বল হলে প্রবাল ধারণের পরামর্শ দেন। নীলা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের যৌগ। তাহলে ভারতে অতি সহজলভ্য ও সুলভ অ্যালুমিনা যৌগ (AL_2O_3)-কে পরিমান মত ব্যবহার করলে একই ফল পাওয়া যাবে না কেন?

জাগতিক বস্তুসমূহ ও গ্রহতারার যখন একই ঈশ্বরের সৃষ্ট, তাদের মধ্যে নিশ্চই নিগূঢ় সম্পর্ক থাকবে—এইরকম এক শিশুসুলভ কল্পনায় পৃথিবীর কিছু গ্রহরত্নের সাথে গ্রহতারার বর্ণের সাদৃশ্যের ওপর দাঁড়িয়ে গ্রহরত্ন ধারণের বিধি। তাই মঙ্গলের দোষ কাটাতে পলা। মঙ্গলের লাল রঙ ফেরিক অক্সাইডের জন্য আর পলার (ক্যালসিয়াম কার্বনেট) লাল রঙ অশুদ্ধির জন্য। সাদৃশ্য কি আদৌ থাকল? তাছাড়া লাল আলোক তরঙ্গই যদি রোগ বিনাশের কারণ হয় তাহলে তা লাল জামা কাপড় পড়লে আরও তাড়াতাড়ি পৃথিবীর মানুষের পেটের রোগ (মঙ্গলের দুর্বলতার কারণে) একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে!

কেতুর জন্য নির্দিষ্ট বৈদুর্যমণি (ক্যাটস্‌আই) বেরিলিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের যৌগ। এই খনিজে আবদ্ধ অশুদ্ধির জন্য পাথরটি নাড়ালে বিড়ালের চোখের মত জ্বলজ্বল করে। ফায়ার ওপালের ভিতর অতি সূক্ষ্ম স্তরবিন্যাস ও ফাটলের জন্য রঙের খেলায় মনে হয় আগুন লকলক করছে। পাথরের বিভিন্ন আলোক প্রতিসরনাঙ্কের জন্য আলোক তরঙ্গের এই খেলাতে জ্যোতিষীরা ধূর্ততার সাথে দুর্বল মানুষের সামনে অলৌকিক দাঁড় করিয়ে জেম থেরামিকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। রক্তমণি (ব্লাডস্টোন) সবুজ রত্নপাথর লাল ফোঁটা যুক্ত। জ্যোতিষে বলা হয় রক্তশোষণ করে রক্তপাত বন্ধ করার ক্ষমতা আছে এর। অথচ রক্তের সাথে লাল রঙ ছাড়া আর কোনোই সাদৃশ্য নেই এর।

ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদে জ্যোতিষশাস্ত্রে চিকিৎসা আবার আলাদা। বাংলাদেশে জ্যোতিষীরা বুধের জন্য পোখরাজ, অন্যদিকে পশ্চিমের জ্যোতিষীরা বৃহস্পতির শক্তি বৃদ্ধির জন্য পোখরাজ এবং বুধের শক্তি বৃদ্ধির জন্য পান্না পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের মাথার ওপর দিয়ে চলমান বুধ বৃহস্পতির চরিত্র কি পশ্চিম ভারতের ওপর অতিক্রম করার সময় কিছু পরিবর্তিত হয়?

রত্ন জ্যোতিষীদের দাবি

আকাশের রামধনু সাতটি মহাজাগতিক রশ্মির সমন্বয়। মানুষের শরীরে সাতটি স্নায়ুচক্র আবর্তিত। এক একটি রঙ এক একটি চক্রের নিয়ন্ত্রক। শরীরে এক বা একাধিক রঙ বা রশ্মি গ্রহণের অক্ষমতায় রোগ দেখা দেয়। যে রঙের ঘাটতি, সেই রঙের রত্ন ধারণে তার দ্রব্যগুণে সেই রঙের ঘাটতি মিটে যায়। যেমন নীলের ঘাটতিতে মৃগী। তাই সমাধান নীলা। রত্নপাথরগুলি কসমিক রশ্মি শোষণ করে শরীরকে রশ্মির ক্ষতিকারক দিক থেকে বাঁচায়।

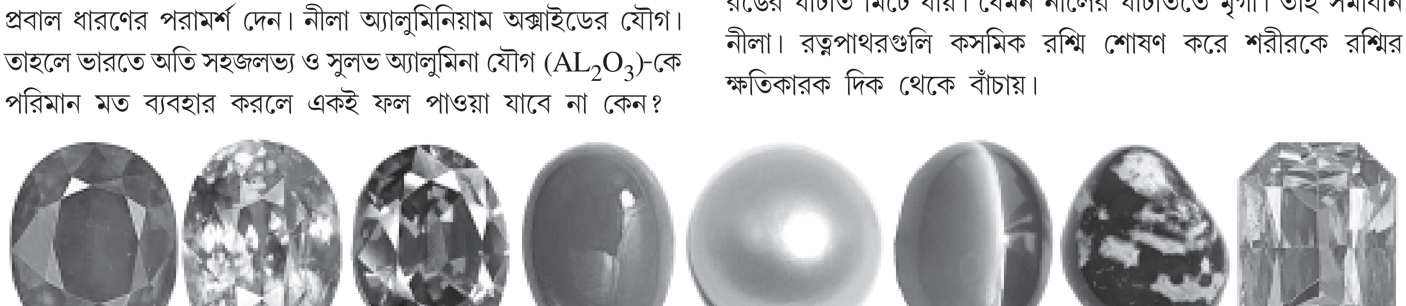

email:gbandyo55@gmail.com • M. 9748127195

ন রে ন্দ্র দা ভো ল কা র

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

নরেন্দ্র দাভোলকার (জন্ম : ১ নভেম্বর ১৯৪৫, হত্যা : ২০ আগস্ট ২০১৩)

প্রমাণ যাচাই করার পদ্ধতি

কোন প্রমাণ সত্য তা কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়? এটা করার জন্য যে পদ্ধতি সেটাই হল বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়া। বিভিন্ন উপাদান যা এই পদ্ধতিকে গড়ে তোলে তা হল— পর্যবেক্ষণ, যুক্তি, অনুমান, যাচাই করা এবং গবেষণা। প্রতিপাদনের আবার তিনটি ধাপ আছে— সরাসরি, পুনরাবৃত্ত এবং সার্বজনীন। এই সব কিছু নিয়ে যা তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই উপাদানগুলি এবার একটু ব্যাখ্যা করা যাক। আজ অবধি সমস্ত আবিষ্কার পর্যবেক্ষণের পরিণাম। আমাদের স্কুলে শেখান হয়েছে যে জেমস ওয়াট বাষ্পশক্তি আবিষ্কার করেছেন। গল্পটা এই রকম। জেমস ওয়াট চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। পাশে একটা কেটলিতে জল ফুটছিল। কেটলির ভিতরে যখন বাষ্প জমে গেল তখন ঢাকনাটা খুলে পড়ে গেল। জেমস ঢাকনাটা লাগিয়ে দিলেন। আবার কিছুক্ষণ বাদে সেটা পড়ে গেল। বারবার এটা হওয়ার

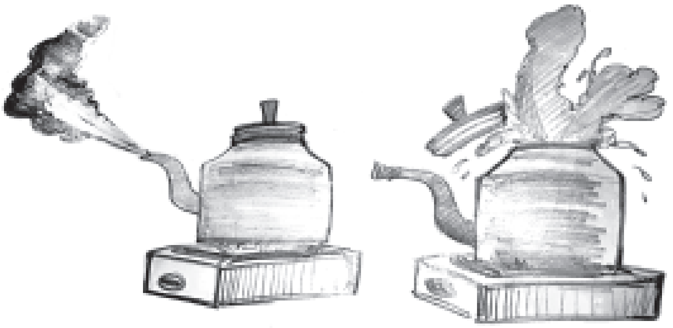

পর উনি ভাবতে শুরু করলেন কী কারণে ঢাকনাটা পড়ে যাচ্ছে। কেটলির মধ্যে তো কোন ভূত বাসা গেঁড়ে নেই। তখন তিনি যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করলেন যে যেহেতু ঢাকনাটা বারবার পড়ে যাচ্ছে, তার অর্থ ভিতরে কিছু আছে যা সেটাকে ঠেলে বার করে দিচ্ছে। এই যুক্তির সূত্র ধরে বাষ্পের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তা আবিষ্কার হল, যার ফলস্বরূপ ইউরোপে শিল্পবিপ্লব। আরেকটা উদাহরণ দেখা যাক— ২৮ ফেব্রুয়ারি আমরা 'জাতীয় বিজ্ঞান দিবস' হিসাবে পালন করি। ওই দিন সি ভি রামণের আবিষ্কার 'রমণ এফেক্ট' বিশ্ববিখ্যাত

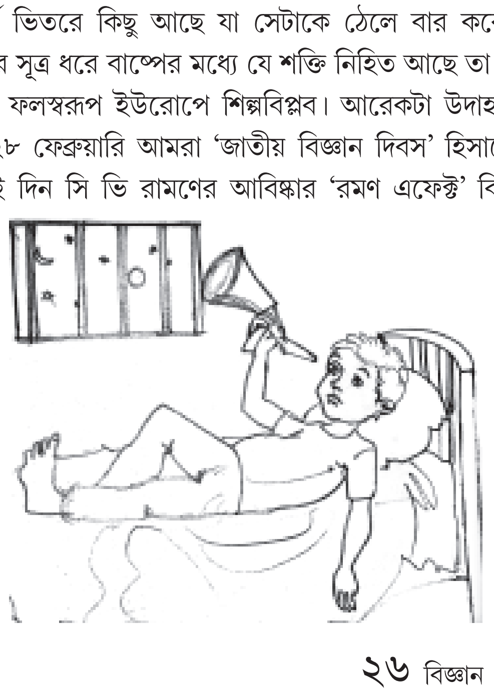

পত্রিকা 'নেচার'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এর জন্য উনি নোবেল পুরস্কার পান। কিভাবে করলেন উনি এই আবিষ্কার? জাহাজে করে উনি ইংল্যান্ড যাচ্ছিলেন। প্রতিদিন উনি ডেকে গিয়ে ওপরে গাঢ় নীল আকাশ আর নিচে গাঢ় নীল সমুদ্র দেখতেন। ওনার কৌতূহল হত এটা কেন হয়। উনি সহজেই ওপরে সুন্দর নীল আকাশ এবং নিচে সুন্দর নীল সমুদ্র সৃষ্টি করার জন্য ঈশ্বরের প্রশস্তি করতে পারতেন। কিন্তু উনি তা করলেন না। উনি যুক্তি প্রয়োগ করলেন এবং অভিনব এক বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করলেন। এর অর্থ কোন ফেনোমেনা পর্যবেক্ষণ করে এবং কী কারণে সেটা ঘটছে এই প্রশ্নটা নিজেকে জিজ্ঞাসা করলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত হয়।

কিন্তু শুধু পর্যবেক্ষণ করে তো সব কিছু প্রমাণিত করা যায় না। ধরা যাক জঙ্গলে তুমি পথ হারিয়ে ফেলেছ। ছোটখাটো কোন আস্তানায় তোমাকে রাতের মধ্যে পৌঁছতে হবে। কিন্তু তুমি জাননা কোথায় তুমি সেই লোকালয় পাবে। তাই কোন পথ ধরে যেতে হবে সেটাও তোমার

অজানা। তারপর যদি তুমি দেখ টিলার একপাশে এক ডজন জায়গায় ধোঁয়া বেরচ্ছে তুমি ভাববে সেখানে একটা লোকালয় থাকলেও থাকতে পারে এবং তুমি সেদিকে হাঁটা শুরু করবে। তোমার এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিটা কি? তুমি তো কোন মানুষ বা কুঁড়েঘর বা তাদের উনুন দেখনি। কিন্তু তুমি জান যেখানেই কাঠ রান্নার জন্য ব্যবহার হয়, সেখানে ধোঁয়া হয়; আর জঙ্গলে তো কাঠ রান্নার জন্যই ব্যবহার হয়। সন্ধ্যাবেলায় রাতের খাবার রান্না হয়। ধরা যাক যদি প্রতিটা কুটিরে উনুন ধরান হয় তাহলে তো এক ডজন জায়গা থেকে ধোঁয়া বেরবে। সুতরাং তুমি এই অনুমানে উপনীত হলে যে সেখানে মানুষ বসবাস করছে এবং তারা রাতের খাবার তৈরি করছে। এই যুক্তির ভিত্তিতে তুমি সেই দিকে যাত্রা করলে এবং তোমার অনুমান সঠিক প্রমাণিত হল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথমে আসে পর্যবেক্ষণ আর যখন পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয় তখন আসে যুক্তি; তৃতীয়ত আসে অনুমান। এবার এই তৃতীয় উপাদান অনুমানের ব্যাখ্যায় আসা যাক। তোমার এক বন্ধু আছে যে সকালে ঘুম থেকে দেরি করে ওঠে। সে পরের দিন সকালে সূর্যোদয়ের সময় তোমার সাথে হাঁটতে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। সে প্রতিজ্ঞা করে পরের দিন খুব ভোরে তোমার বাড়িতে চলে আসবে।

যেহেতু তুমি জান যে এটা করতে অপারগ তুমি কি তার সাথে তর্ক করবে? তুমি কি তাকে বলবে, 'সূর্যোদয়ে হাঁটতে যাবে তুমি? তুমি কি করে নিশ্চিত হলে যে আগামীকাল সূর্যোদয় হবে?' না তুমি সেটা করবে না। কিন্তু কী ভাবে একজন জানবে আগামীকাল আদৌ সূর্যোদয় হবে কি না? যখন আমরা কয়েক দিন আগে কারো সাথে দেখা করার দিন ঠিক করি আমরা কি করে জানি ওই দিনগুলো আদৌ পৃথিবীতে আসবে কি না? আমরা এই অনুমানটা করি এই জ্ঞান থেকে যে গত ৪৬০ কোটি বছর ধরে রোজ সকালে নিয়ম করে সূর্যোদয় ঘটেছে। সূর্য কোন ছুটি নেয়নি। যদি একদিনের জন্যেও নিত তাহলে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর সেটা চিরকালের মত 'ছুটি' হয়ে যেত। যেহেতু এতদিন ধরে সূর্য নিয়মিত উদয় হচ্ছে তুমি নিশ্চিত যে আগামীকালও সেটা হবে এবং তুমি সকালে হাঁটতে যেতে পারবে। এটা হচ্ছে অনুমান।

পরবর্তী উপাদান হচ্ছে যাচাই করা। আমরা জানিয়েছি যে এর তিনটি ধাপ আছে— যাচাই করা, বারবার যাচাই করা এবং সর্বজনীন ভাবে যাচাই করা। যাচাই করার অর্থ কি? আদি শঙ্করাচার্য বলেছিলেন, যদি একশোজন প্রাজ্ঞ মানুষও তোমার বলে যে আগুন ঠান্ডা তুমি কি তা বিশ্বাস করবে? না, তুমি করবে না। যদি ওই একশোজন পন্ডিত বলে, 'এটা শুধু আমাদের মুখের কথা না, এটা বইয়েও লেখা আছে', তাহলে তুমি কি বলবে? 'আমি আপনাদের সম্মান করি কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় আমি বুঝেছি যে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে'। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা সত্যতা যাচাই করা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এবার আমরা বারবার যাচাই করার অভিজ্ঞতা কি সেটা দেখব। কেউ তোমাকে বলল একটা মন্ত্রপূত আংটি ব্যবহার করলে সেই ব্যক্তির এক মাসের মধ্যে চাকরি হয়ে যাবে। তুমি তার কাছে প্রমাণ চাইলে। সে বলল সে নিজে এবং তার পড়শি সেটা ব্যবহার করেছে এবং দুজনেই এক মাসের মধ্যে চাকরি পেয়ে গেছে। তুমি তার সাথে তর্ক জুড়ে দিয়ে বলবে যে এই অভিজ্ঞতাটা বহুবার পুনরাবৃত্তি করা যাক। দশ হাজার এই ধরনের আংটি বানিয়ে দশ হাজার বেকার ছেলেমেয়েদের দেওয়া যাক। যদি এক মাসের মধ্যে এরা সবাই চাকরি পেয়ে যায় তাহলে আমরা মেনে নেব যে এই আংটির কিছু অতিপ্রাকৃত গুণ আছে যার ফলে বেকাররা চাকরি পেয়েছে। শুধুমাত্র একটা দুটো উদাহরণ থেকে আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না। কোনো সিদ্ধান্তে আসতে গেলে প্রচুর উদাহরণ দরকার। এটা হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির নির্যাস। আবার যাচাই করার এই প্রক্রিয়াটা সর্বজনীন হতে হবে। সর্বজনীন না হলে সেটা বিজ্ঞান হয় না। যদি তুমি বল একটা বিশেষ শহরের অধিবাসীরাই শুধু এই আংটিটা ব্যবহার করলে চাকরি পাবে, তাহলে সেটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি আংটিটার গুণে সত্যিই কেউ চাকরি পেতে পারে, তাহলে যে কোন ব্যক্তি, সে যে জায়গারই হোক এটা ব্যবহার করলে এক মাসের মধ্যে চাকরি পাবে। ধরা যাক একটা বিশেষ রোগর জন্য কোন ওষুধ তৈরি হয়েছে। তাহলে এই ওষুধ পৃথিবীর যে কোন জায়গায়, যে কোন মানুষের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। মাধ্যাকর্ষণের সূত্র যখন আবিষ্কার হয় তখন সেটা পৃথিবীর যে কোন জায়গায় প্রয়োগের দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি যাচাই করার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা বহু সংখ্যায় পুনরাবৃত্তি হয় এবং যা সর্বজনীন ভাবে প্রযোজ্য।

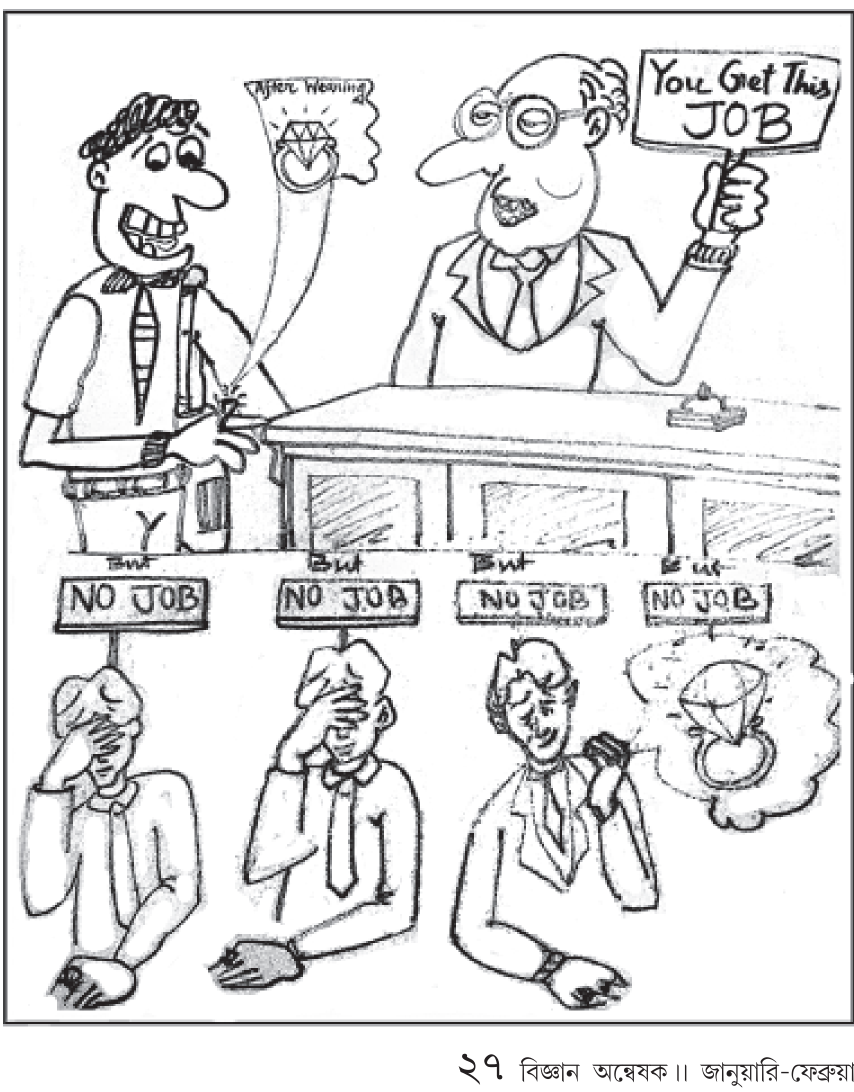

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির শেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল গবেষণা। যে কোন ব্যক্তি কোন বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করতে পারা উচিত। জল ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ফোটে। এর অর্থ পৃথিবীর যে কোন জায়গায় এই তাপমাত্রায় জল ফুটবে, তা সে মুম্বই, কলকাতা, লন্ডন অথবা মাদ্রাজ যেখানেই হোক। যদি দেখা যায় কম কি বেশি তাপমাত্রায় ফুটছে তাহলে কি হবে? তাহলে জল ফোটার তাপমাত্রার অংকের ওঠা নামা কীভাবে নির্ধারিত হয়, এর ওপরে আবার একটা সর্বজনীন সূত্র প্রয়োজন হবে। এমনটা নয় যে মুম্বাইয়ে ৯০ ডিগ্রিতে জল ফোটান যাবে এবং জ্বালানি বাঁচান যাবে যেহেতু সেখানকার লোকেরা খুব ধার্মিক। আর মস্কোর লোকেরা নাস্তিক বলে সেখানে ১১ ডিগ্রিতেই জল ফুটে যাবে। পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। সুতরাং প্রথমে পর্যবেক্ষণ এবং সেটার ফলে

যে প্রশ্নটা স্বাভাবিক ভাবে উঠে আসে তা হল ‘কী ভাবে’। যখন পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয় তখন আসে কারণ বা যুক্তি। এরপর অনুমান, যাচাই করা এবং গবেষণা। এই সমগ্রটা নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মূল্যবোধও নিহিত আছে। এটা একজন মানুষ জীবনকে কি ভাবে দেখবে সেটা নির্ধারিত করে দেয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তার পদ্ধতির মধ্যে এই মূল্যবোধ সন্নিহিত। মূল্যবোধের প্রধান পাঁচটি উপাদান হল ঃ সঠিক আচরণ, স্বশাসন, অনুসন্ধিৎসু (অথবা জ্ঞানলিপ্সা), সাহস (অথবা ভয়শূন্যতা), বিনয় (অথবা নম্রতা)।

সঠিক মানসিকতা

যখন তুমি বৈজ্ঞানিক চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন তোমাকে প্রতিটি সমস্যা সবরকম দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করতে হবে। মহারাষ্ট্রে ১৯৭৩ সালে খরা হয়েছিল। জুলাই মাস অবধি কোন বৃষ্টি হয়নি। রাজ্যপাল রাজ্যের মানুষকে আহ্বান করলেন তাদের নিজ ঈশ্বরের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে। এটা সত্যি মহারাষ্ট্রে তখন জলের ভয়ানক আকাল। যে কোন সংকটে ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী হওয়া মানুষের মজ্জাগত। সেই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ প্রভুর কৃপা প্রার্থনা করে। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করতে পারেন আবার নাও করতে পারে। সেটা অন্য বিষয়। কিন্তু ওপরওয়ালা আমাদের শক্তি যোগান এবং এই শক্তির সন্ধান করাতে অন্যায় কিছু নেই। বেশিরভাগ লোক এভাবেই ভাবে। সংবিধানও আমাদের উপাসনা করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। তাই রাজ্যপাল যখন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান জানালেন আমরাও একটা প্রচারপত্র প্রকাশিত করে তাতে লিখলাম যে এর দ্বারা মহারাষ্ট্রের মহান সমাজ সংস্কারকদের অপমান করা হচ্ছে। ঈশ্বরের ওপর আস্থা না রাখার জন্য মানুষ আমাদের ওপর ক্ষেপে গেল। অমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে ভগবানে বিশ্বাস করা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করার অধিকার মানুষের আছে। কিন্তু যদি খোলা মনে চিন্তা করে দেখেন কেন আমরা প্রার্থনা করাটা সঙ্গত মনে করিনি তাহলেই বুঝতে পারবেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক মানসিকতা বলতে কি বোঝায়।

মহারাষ্ট্রে জলের আকালের কারণটা কি? এমনটা তো নয় যে আগের বছর রাজ্যে বৃষ্টি হয়নি। রাজ্যের গড় বৃষ্টিপাত ১০০০ থেকে ১২০০ মিমি। কিছু পাহাড়ি এলাকায় ২০০০ থেকে ২৫০০ মিমি। আবার কোন অঞ্চলে ৪৫০ থেকে ৭০০ মিমি। মহারাষ্ট্রের ৩০০ তালুকের মধ্যে প্রায় ১০০টি হচ্ছে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল যেখানে গড় বৃষ্টিপাত ৫০০ থেকে ৭০০ মিমি। গত একশো বছরে মহারাষ্ট্রের এই সব অঞ্চলের গড় বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, দু-এক বছর বাদ দিলে এই সব এলাকায় বৃষ্টিপাতের ঘাটতি কখনই দেখা যায়নি। এর অর্থ আমাদের রাজ্যের কিছু অঞ্চলে ন্যূনতম ৫০০ থেকে ৭০০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়, অন্যান্য অঞ্চলে তো আরো বেশি হয়। কিন্তু এই সব অঞ্চলে প্রতি গ্রীষ্মে চাষের জলের কথা তো ছেড়েই দিলাম, পানীয় জলেরও বিপুল ঘাটতি দেখা যায়। এটা সর্বত্র প্রমাণিত হয়েছে যে ৪৫০-৫০০ মিমি বৃষ্টিপাতের ফলে যতটুকু জল পাওয়া যায় তা বাঁধ দিয়ে সঞ্চয় করলে মাটিতে সিঞ্চিত হয়, যা বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করলে সারা বছর ধরে যথেষ্ট পানীয় জল পাওয়া যায় এবং শুধু তাই নয় একটা শস্যের সেচের জলও প্রাপ্ত হয়। এমনটা নয় যে এটা মহারাষ্ট্রে করা যেতে পারে না। বিজয় বোরদে আউরঙ্গাবাদের কাছে আঙ্গাঁওয়ে, আন্না হাজারে রালেগাঁসিদ্ধিতে, দ্বারকাদাস লোহিয়া বিড়ে এবং বসন্ত গঙ্গাওয়ানে রত্নগিরি জেলায় এটা করে প্রমাণিত করেছেন। যদিও সমাধানের এই উপায় মহারাষ্ট্রের কিছু ক্ষুদ্র অঞ্চলেই প্রয়োগ করা হয়েছে, রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তা এখনো চালু হওয়া বাকি।

ইজরায়েল এক অনন্য উদাহরণ যেখানে বৃষ্টিপাত প্রতি বছরে নামমাত্র, ৫-৬ ইঞ্চি (১২.৫-১৫ মিমি)। এরা বাকি পৃথিবীকে সবজি রপ্তানি করে আর আমাদের চাষিরা সেখানকার সেচ ব্যবস্থা শিখতে যায়। এটা দেখায় ইজরায়েলের মত দেশ যেখানে বৃষ্টিপাত সীমিত সেখানেও যথাযথ পরিকল্পনা করে জলসংকট সমস্যার সমাধান করা যায়। মহারাষ্ট্রে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতি বছর আরো বেশি বেশি করে আমাদের জলের অভাব হয়। এটা মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যা, কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়। আমাদের রাজনীতিবিদদের অক্ষমতার কারণেই এটা মনুষ্যসষ্ট। বৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা আর একজন ছাত্র বিনা পরিশ্রমে পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য ভগবানকে তুষ্ট করা, দুটি প্রচেষ্টা একই পর্যায়ে পড়ে। একটা সমস্যাকে ভালো করে বোঝার জন্য সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা ভালোভাবে যাচাই করা দরকার। সেটাই হচ্ছে একটা সমস্যা সমাধানের সঠিক মানসিকতা।

আত্মনির্ভরতা (অথবা আত্মনিয়ন্ত্রণ)

আত্মনির্ভরতা বলতে আমরা কি বুঝি? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ং বিদ্যমান এবং কারণ ও প্রভাবের নিগড়ে বাঁধা। বিশ্বে যা কিছু ঘটে সব কিছুর উৎসেই কারণ ও প্রভাবের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কোনো কিছুই এই সম্পর্ককে উপেক্ষা করে ঘটতে পারে না। মানুষ অবশ্যই প্রতিটি ফেনোমেনার কারণ ও প্রভাবের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, যেমন ধরা যাক ক্যানসারের কারণ। কিন্তু একটা ফেনোমেনার কারণ ও প্রভাব কিভাবে তদন্ত করতে হয় সেই পদ্ধতিটা আমরা জানি। আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি শুভ বা অশুভ এমন কোনো সর্বোচ্চ ক্ষমতা নেই যেটা পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা নিয়ন্ত্রণ করছে। একবার যদি তুমি এই ধরনের ক্ষমতার অস্তিত্ব স্বীকার কর তুমি বিশ্বাস করতে শুরু করবে যে শুভশক্তির কাছে প্রার্থনা করলে আমি উপকৃত হতে পারি। একই সাথে তুমি এটাও বিশ্বাস করবে যে অশুভশক্তিকে তুষ্ট করলে তুমি কোন বিপর্যয় এড়াতে পারবে কিংবা কোন যাগযজ্ঞ করে সেই বিপর্যয় অন্য কারো ঘাড়ে ঠেলে দিতে পারবে। আজকের এই আত্মনিয়ন্ত্রিত বিশ্বে কারণ ও প্রভাবের সম্পর্ককে উপেক্ষা করে এইরকম করা অবশ্য অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। **সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ হচ্ছে—যা কিছু ঘটে সেটারই কারণ ও প্রভাব সম্পর্ক আছে; এই সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায়; কিছুদিনের জন্য এই আবিষ্কার অসম্পূর্ণ হতে পারে কিন্তু তদন্তের গতিপথটা ঠিক এবং অবশেষে সম্পর্কটার সন্ধান মেলে।** আমরা আবিষ্কারের সীমাবদ্ধতাগুলোও অপসারণ করতে পারি। এর ফলে জীবন আরো আনন্দময় হয়ে ওঠে।

জ্ঞানলিপ্সা

জ্ঞানলিপ্সুতা হচ্ছে তৃতীয় উপাদান যার অর্থ উদগ্রীব হয়ে অনুসন্ধান করা। আমি আপনাকে দুটো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। প্রশ্নগুলি আমার নিজের নয় এবং এগুলি পূর্বে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। গ্রীষ্মকালে কিছু মানুষ কালো কলসিতে জল ভরে রাখে আবার অন্যরা লাল কলসিতে রাখে। প্রশ্ন হচ্ছে কালো কলসির জলটা কি লাল কলসির চেয়ে বেশি ঠান্ডা হয়। দ্বিতীয় প্রশ্নটা সিসিলির রাজা তাঁর সভাসদদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটা জলভরা পাত্রে যদি একটা জ্যান্ত মাছ ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে জল উপচে পড়ে না অথচ একটা মরা মাছ রাখলে জল বেরিয়ে আসে। কারণটা কি? আমি এক মিনিট দিচ্ছি এর উত্তর দেওয়ার জন্য।' আপনারা কি কেউ এর উত্তর দিতে চান? সাধারণত যে উত্তর আমরা পেয়ে থাকি সেটা আমি জানাচ্ছি। কালো রঙ লালের চেয়ে বেশি তাপ টেনে নেয় সেই কারণে কালো কলসির জল লাল কলসির চেয়ে কম ঠান্ডা থাকে। দ্বিতীয় উত্তরটা হচ্ছে, একটা জ্যান্ত মাছ জলের অক্সিজেন শুষে নেয় কিন্তু একটা মরা মাছ নিচে তলিয়ে যায় যার ফলে জল অপসারিত হয়ে উপচে পড়ে। সিসিলির বিজ্ঞ সভাসদরা একই উত্তর দিল। কিন্তু একবারও ভেবে দেখল না এই ফেনোমেনাগুলো কে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং কিসের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। আমাদের যা বলা হয়ে থাকে আমরা সেটাই বিশ্বাস করি। কানায় কানায় ভরা একটা পাত্রে জ্যান্ত বা মরা মাছ যাই ছাড়া হোক জল উপচে পড়বে। একই ভাবে জল কতটা ঠান্ডা হবে সেটা নির্ভর করে পাত্রটা কতটা সচ্ছিদ্র এবং সেটার বহিস্তর থেকে কতটা জল বাষ্পীভূত হয়। পাত্রের রঙের ওপর এটা নির্ভর করে না। যা কিছু আমাদের সামনে আসে আমরা সেটা যাচাই না করে তৎক্ষণাৎ তাতে সাড়া দিই। এটা জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ঠিক নয়।

ভয়শূন্যতা

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির চতুর্থ উপাদান হচ্ছে ভয়শূন্যতা। যখন কেউ একটা বৈজ্ঞানিক সত্য ব্যক্ত করে যেটাতে সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তখন তাকে প্রচলিত ব্যবস্থার মাতব্বরদের ক্রোধের শিকার হতে হয়। সেই ধরনের একটা অবস্থায় তুমি যে সত্যটা বিশ্বাস কর সেটা নির্ভীক ভাবে বলতে পারছ কি পারছ না সেটা পরীক্ষিত হয়। সক্রেটিস যখন এই ধরনের একটা সত্য ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে পাশের ঘরে গিয়ে কাপে রাখা বিষ পান করতে বলা হয়েছিল। তিনি নির্লিপ্তভাবে সেটা পান করেছিলেন। যখন তুমি সত্যের সন্ধানে বেরিয়েছ তখন সেটার পরিণতি সম্পর্কে ভয় পেলে চলবে না। তোমার এই সন্ধানের মূল্য চোকানোর জন্য তোমার প্রস্তুত থাকা উচিত, সেটা যাই হোক না কেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সত্যের সন্ধানে এই ধরনের পথ অনুসরণ করা দাবি করে যেখানে ভয়শূন্যতা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই বৈজ্ঞানিক সত্য শুধুমাত্র ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে হবে এমনটা নয়। সেটা সামাজিক ক্ষেত্রেও হতে পারে। ষাট বছর আগে পুণেতে এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি আন্তরিকভাবে সবাইকে বলতেন যে আমাদের দেশের সমূহ বিপদ কারণ জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বাড়ছে। এই লাগামছাড়া বৃষ্টি রোধ করতে আমাদের অবশ্যই পরিবার পরিকল্পনা চালু করতে হবে। তখন কেউ তাঁর কথায় কান দেয়নি। বাস্তবে তাঁকে পাগল বলে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দৈনন্দিন শব্দভান্ডারে 'পরিবার পরিকল্পনা' এবং 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' এখন স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু তখন এই শব্দগুলো অশ্লীল মনে করা হত। এই সাহসী ব্যক্তিটি কে ছিলেন যিনি ওই সময়ে এই অশ্লীল শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন? তিনি ছিলেন ভারতরত্ন ধোন্ডো কেশভ কার্ভের পুত্র। 'পরিবার পরিকল্পনা' এবং 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' শব্দগুলি ব্যবহারের জন্য, সেগুলি নিয়ে লেখালেখি এবং প্রচার করার জন্য ওনাকে আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যত বাধাই আসুক না কেন তিনি কিন্তু জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনার প্রচার করা কোনোদিন বন্ধ করেননি। উনি ওই সময়ে নির্ভীক ভাবে সত্যটা বলেছিলেন। তখন যদি ওনার কথায় আমরা কান দিতাম তাহলে আমাদের দেশ আজকে এই বিপুল সমস্যার সম্মুখীন হত না। বহুকাল আগেই আমরা এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারতাম।

বিনয়

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পঞ্চম উপাদান হচ্ছে নম্রতা অথবা বিনয়। বিজ্ঞান সর্বদা বিনয়ী। ধর্ম অহঙ্কার করে যে সঠিক উত্তর তার জানা আছে এবং সেই উত্তরটাই চূড়ান্ত। ধর্ম যা জানে তা অতিক্রম করার প্রয়োজন বোধ করে না। ধর্মীয় গুরু যে ব্যাখ্যা দেয় সেটাই সবার মেনে চলা উচিত কারণ সেটাই অন্তিম সত্য। অপরদিকে বিজ্ঞান সব সময় স্বীকার করে যে তার জ্ঞান একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান সেই সময় অবধি প্রাপ্ত প্রমাণাদির ওপর ভিত্তি করে মীমাংসায় উপনীত হয়। ভিন্ন কিছু গোচরে আসলে বিজ্ঞান সব সময় তার মতামত পাল্টাতে প্রস্তুত। বিজ্ঞান বিনয়ী। এর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে নতুন গবেষণা এবং নতুন প্রমাণের আলোকে মতামত পরিবর্তন করা। ধর্ম বিনয়ী নয় এবং কখনও তা ছিল না। ধর্মের এক মসীহা আছে এবং সেই মসীহার কথাই চূড়ান্ত সত্য।

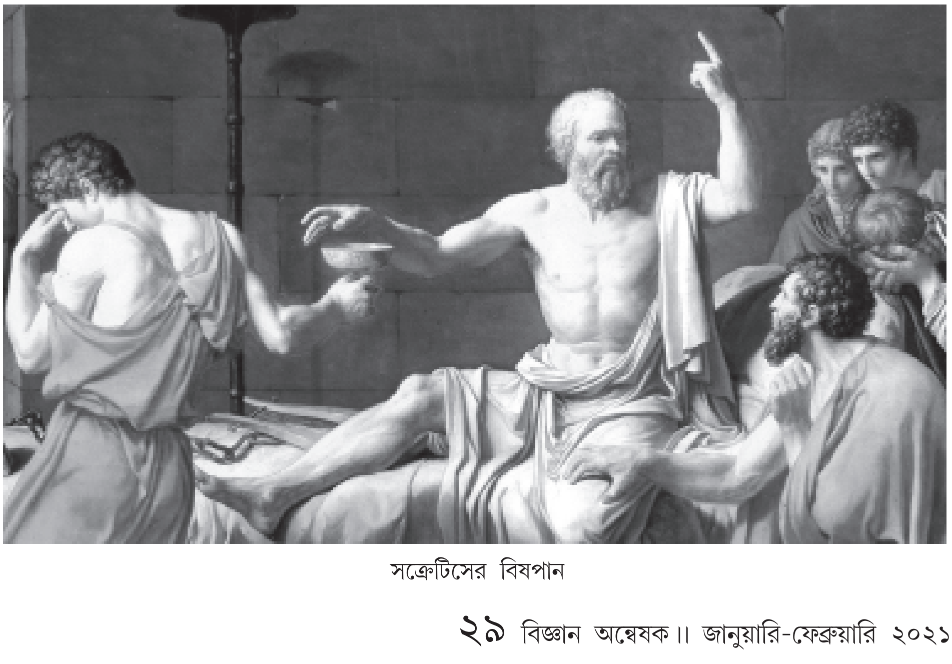

সক্রেটিসের বিষপান

ভাষান্তর : সোমনাথ গুহ

সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

জনভাবনায় গণটিকা ঃ প্রসঙ্গ করোনার ভ্যাকসিন

৮ ডিসেম্বর করোনা অতিমারির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত যুদ্ধজয়ের শুভসূচনা হল। এইদিন ব্রিটেনে এক নবতিপর বৃদ্ধা মার্গারেট কিন্যানকে কোভিড-এর বিরুদ্ধে লড়াই-এ সক্ষম টিকার প্রথম ডোজটি দেওয়া হল। টিকাকরণের ইতিহাসেও এই ঘটনা এক নতুন যুগের সূচনা করল। কারণ যেকোনও সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে এত অল্প সময়ে (মাত্র ১১ মাস) টিকা তৈরি ও ব্যবহারের প্রেক্ষিতে ঘটনাটি নজিরবিহীন।

করোনা অতিমারি রুখতে টিকার মত একটি কার্যকরী হাতিয়ার ছিল বিশ্বের আপামর জনগণের কাছে ভীষণ জরুরি, তাই গভীর আকাঙ্ক্ষার। বিজ্ঞান গবেষণা জনগণের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে যে সফল, সেটা বলাই বাহুল্য। তবে এই হাতিয়ার ব্যবহার করে কত তাড়াতাড়ি 'অতিমারি-যুদ্ধ' জয় করা যাবে, তা নির্ভর করবে কয়েকটা বিষয়ের উপর। সেই নিয়েই আজকের আলোচনা।

নানা দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা টিকা তৈরির কাজে এগিয়ে এসেছে। করোনার টিকা তৈরিতে বিশ্বজুড়ে এক অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। বর্তমানে ৫৮টি টিকা (ভ্যাকসিন) ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটির কার্যকারিতা ৯০ শতাংশের উপর বলে দাবি করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি থেকে। সমস্ত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সম্পূর্ণ করে টিকাকরণের পর্যায়ে হাতে গোনা যে তিনটি সংস্থার ভ্যাকসিন বহুল চর্চিত, তারা হল ফাইজার-বায়োএনটেক, অক্সফোর্ট-অ্যাস্ট্রাজেনেকা ও মডার্না। এর মধ্যে ফাইজার-বায়োএনটেক এর ভ্যাকসিনই ব্রিটেনে চালু হল।

আপাতত অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৈরি চ্যাডক্স-১ (এজেডটি-১২২২, যা ভারতে কোভিশিল্ড বলে বাজারজাত হবে) একমাত্র তাদের সমস্ত ট্রায়ালের ফলাফল মেডিক্যাল জার্নাল 'ল্যানসেট'-এ প্রকাশ করেছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে ট্রায়ালে প্রাপ্ত ফলাফলে। রয়েছে বেশকিছু প্রশ্নও। যার সদুত্তর পাওয়া যায়নি। বলা হয়েছে, মানবশরীরের জন্য এটি নিরাপদ। উল্লেখযোগ্য কোনও পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কার্যকারিতার হার অর্থাৎ এফিকেসি রেট ৭০%। ২৩ এপ্রিল থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত চলা ৪টি ট্রায়ালে ব্রিটেন, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৩,৮৪৮ জন স্বেচ্ছাসেবক ২৮ দিনের ব্যবধানে দুবার টিকার ডোজ নেন। পরীক্ষামূলক প্রয়োগের পর হয়েছে প্রাপ্ত ফলাফলের বিশ্লেষণ। তবে ব্রাজিল ও ব্রিটেনে ১১৬৩ জনের উপর করা ট্রায়ালের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফলই তুলে ধরা হয়েছে জার্নালের প্রবন্ধে। বাকি রয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বেচ্ছাসেবকদের উপর করা ট্রায়ালের ফলাফল। ব্রিটেনে করা একটি ট্রায়ালে আবার ভুলবশতঃ প্রথমবার দেওয়া হয় হাফডোজ। দ্বিতীয়টি ফুল (স্ট্যান্ডার্ড) ডোজ। ফলাফলের তুলনার সময় দেখা গেল হাফডোজ/ফুলডোজ গ্রুপে কার্যকারিতা পাওয়া গেছে ৯০%, অথচ দুবার ফুলডোজ দিয়ে পাওয়া গেছে ৬২%। সামগ্রিক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত কার্যকারিতা ৭০%।

মনে হতে পারে, এই এফিকেসি-র মানে ১০০ জন ব্যক্তিকে এই টিকা দেওয়া হলে ৭০ জন ব্যক্তি সুরক্ষা পাবেন। না, বিষয়টি এতটা সরলীকৃত নয়, আদতে এই এফিকেসি রেট নির্ণীত হয় টিকাপ্রাপ্ত গ্রুপ ও কন্ট্রোল গ্রুপের (অন্য টিকা বা স্যালাইন-ওয়াটার প্রাপ্ত) স্বেচ্ছাসেবীদের রোগগ্রস্ত হওয়া তথা প্রতিরোধহীনতার তুলনামলক বিচার করে। খুব সহজ করে বললে, এক্ষেত্রে যেমন সামগ্রিকভাবে ৩৫ জন টিকাপ্রাপ্ত ও ১০১ জন কন্ট্রোল গ্রুপের স্বেচ্ছাসেবকের রোগ প্রতিরোধহীনতা নজরে পড়েছিল। বলা যায়, ১০১ জনের তুলনায় ৭১ জন (১০১ বিয়োগ ৩০) রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখিয়েছে। শতাংশের হিসাবে যা ৭০ শতাংশ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এগিয়ে থাকা আরও দুটি টিকা অর্থাৎ মডার্না ও ফাইজার-বায়োএনটেক-এর টিকার এফিকেসি রেট যথাক্রমে ৯৪ ও ৯৫ শতাংশ। এই তিনটি টিকার উপাদান ও সংরক্ষণ তাপমাত্রাতেও কিছু হেরফের আছে।

অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রোজেনেকার টিকা অ্যাডিনো ভাইরাস সম্বলিত (রিকমবিন্যান্ট) ভ্যাকসিন। অন্যদিকে মডার্না ও ফাইজার-বায়োএনটেক উভয়েরই উপাদান মডিফায়েড এমআরএনএ সম্বলিত শিক্ষিত ন্যানোপার্টিক্যাল। কিন্তু টিকা সংরক্ষণের তাপমাত্রা যেখানে প্রথমটির ক্ষেত্রে ২-৮° সে., দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির ক্ষেত্রে সেখানে যথাক্রমে মাইনাস ২০° সে. এবং মাইনাস ৭০° সে.।

অক্সফোর্ড ভ্যাকসিনটির এফিকেসি তুলনা কম (৭০ শতাংশ) তো বটেই সঙ্গে রয়েছে একটি দুর্বলতা। এটি বয়স্ক (৫৫ বছরের বেশি)-দের ক্ষেত্রে ও কো-মর্বিড রোগীদের ক্ষেত্রে কতটা সুরক্ষা দেবে, তাও তাদের প্রকাশিত প্রবন্ধে স্পষ্ট নয়। তবে উৎপাদন মূল্য কম হওয়ায় ও সংরক্ষণ তাপমাত্রাজনিত সুবিধা থাকায় এটির বহুল ব্যবহারের সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল।

প্রয়োজনভিত্তিক অগ্রাধিকারের সূত্রে সারাদেশের কিছু পেশায় যুক্ত মানুষকে প্রথম পর্যায়ে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে, এমনটাই শোনা যাচ্ছে। চলছে এই নিয়ে নানা জল্পনা। কৌতুহলী মানুষ তো বটেই, বিজ্ঞানী ও নীতি নির্ধারকদের মধ্যেও রয়েছে দ্বন্দ্ব। সুষ্ঠু টিকাকরণ নীতি

প্রয়োগের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রতিরোধ (হার্ড ইমিউনিটি) তৈরি করাই হবে মূল লক্ষ্য। কারণ ব্যক্তিসুরক্ষার পাশাপাশি জনগোষ্ঠীর 'ইমিউন থ্রেশল্ড' বাড়িয়ে রোগ-বিস্তার (ট্রান্সমিশন) কমাতে পারলেই অতিমারিতে রাশ টানা যাবে। এর জন্য প্রয়োজন অতিসংবেদনশীল (ভার্নারেবল) মানুষদের রক্ষা করা, সাথে সাথে জনগোষ্ঠীতে সবচেয়ে মেলামেশা করা মানুষদের ইমিউন করে তোলা। প্রথম দলে রয়েছেন বয়স্ক ও কো-মর্বিডরা আর দ্বিতীয় দলে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, পুরকর্মী ইত্যাদি। অবশ্যই এই দ্বিতীয় দলে থাকা উচিত দোকানদার, বাস কন্ডাক্টর, ব্যাঙ্ক ও বিমাকর্মী যাদের পেশার সুবাদে প্রতিনিয়ত জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। সুষমভাবে বৃহত্তর ইমিউন জনগোষ্ঠীর মানুষ বাকিদের সঙ্গে মেলামেশা করলে গড়ে ওঠে হার্ড ইমিউনিটি, বাধা পায় ভাইরাস তথা রোগের বিস্তার।

আদর্শভাবে টিকাকরণের মাধ্যমে অতিমারি প্রতিরোধে অন্যতম বাধা বহুজাতিক সংস্থাগুলির মুনাফা লাভের প্রতিযোগিতা। অন্যদিকে রয়েছে ভ্যাকসিন বিরোধী জনমত তৈরির একটি অপচেষ্টা। এই প্রবণতা কিছুটা স্বাধীনচেতা মানুষের অতি-সক্রিয়তা, কিছুটা অজ্ঞতাজনিত সংশয় এবং কিছুটা অর্ধ-সত্য তথ্যের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত সঞ্চালনের কারণে সৃষ্ট। সব মিলিয়ে বর্তমানে তৈরি হয়েছে একটি সামগ্রিক অস্পষ্টতার বাতাবরণ।

বহুজাতিক সংস্থাগুলিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের করা ভ্যাকসিন ডোজের অগ্রিম বুকিং দেখে মনে হচ্ছে পশ্চিমের উন্নত দেশ ও তথাকথিত উন্নয়নশীল/অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে ভ্যাকসিন প্রাপ্তিতেও অসাম্য আসতে চলেছে। অথচ করোনা অতিমারির প্রকোপ যেহেতু বিশ্বব্যাপী, তাই প্রয়োজন ছিল সামগ্রিক 'মানবজাতি'র রোগ-প্রতিরোধে আর্থ-সামাজিক (এবং রাজনৈতিক) সমস্ত রকম ভেদাভেদ ভুলে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে নিবিড় সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথ-মোকাবিলার প্রয়াস নেওয়ার। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জন-চেতনা সেই প্রত্যাশাই করে।

email:joardar69@gmail.com • M. 9231533335

নতুন গবেষণার অলিন্দে

অমিতাভ চক্রবর্তী

বিগ ব্যাঙ পরবর্তী নিউক্লিয় বিক্রিয়ার সন্ধান করছেন বিজ্ঞানীরা

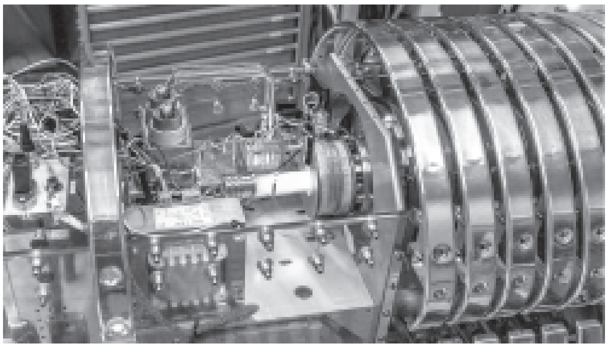

নিউক্লিয় সংশ্লেষণ পক্রিয়ার গবেষণায় ব্যবহৃত যন্ত্রের অংশবিশেষ

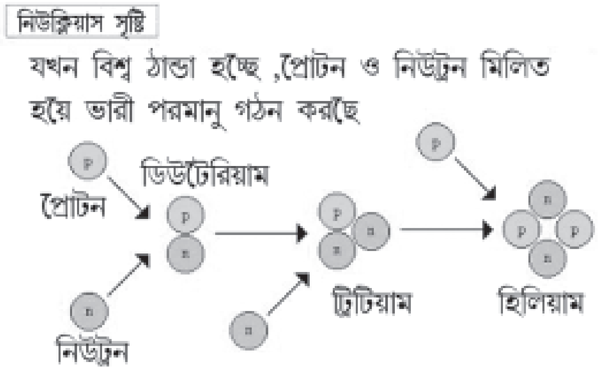

গবেষণাগারটির নাম Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics, বিজ্ঞানীরা সংক্ষেপে বলেন LUNA। ইতালিতে পাহাড়ের অনেকটা নীচে সুরঙ্গের গভীরে এই গবেষণাগারে পরীক্ষানিরীক্ষা করে চলেছেন একদল পদার্থবিদ। ওঁরা কৃত্রিমভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সূচনাকালের ক্ষণিক পরের অবস্থা অর্থাৎ বিগ ব্যাঙের দুই থেকে তিন মিনিট পরবর্তী পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। ফলে ঘটে চলেছে মহাকালের সেই প্রাথমিক নিউক্লিয় বিক্রিয়াগুলি। সৃষ্টির ঊষাকালে মৌলের নিউক্লিয়াস সৃষ্টির এই বিক্রিয়াগুলি নিয়ে তত্ত্বগত কাজ শুরু করেছিল বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকেই। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ও জটিল গাণিতিক হিসাবনিকাশের প্রয়োগে পোক্ত হয়েছে সেই তত্ত্বগত ধারণার ভিত্তি। তবে এবার বিজ্ঞানীরা সেই তত্ত্বকেই যাচাই করে নিতে চাইছেন পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের কষ্টিপাথরে। LUNA-এর অত্যাধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সম্ভব হয়েছে এই অসাধ্য সাধন। তাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও হিসেবনিকাশের খুঁটিনাটি সম্প্রতি (১১ নভেম্বর, ২০২০) প্রকাশিত হয়েছে নেচার পত্রিকায়।

ওদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মহাবিস্ফোরণের প্রথম তিন মিনিটের মধ্যেই নিউক্লিয় সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় ডিউটেরিয়ামের নিউক্লিয়াস। একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রনের সমন্বয়ে তৈরি এই পরমাণুকেন্দ্রক আসলে হাইড্রোজেনের একটি সমস্থানিক বা আইসোটোপের নিউক্লিয়াস। খুব শীঘ্রই অধিকাংশ ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়াস সংযোজিত হয়ে হিলিয়াম বা লিথিয়ামের মত স্থায়ী নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। অবশ্য তা সত্ত্বেও খুব সামান্য পরিমাণ ডিউটেরিয়াম সৃষ্টির স্মৃতিচিহ্ন বুকে নিয়ে আজও মহাবিশ্বে রয়ে গেছে। মৌলের উপস্থিতির নিরিখে আমাদের প্রত্যেকের শরীরেও রয়েছে যৎসামান্য ডিউটেরিয়াম।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রকৃতিতে উপস্থিত ডিউটেরিয়ামের সঠিক পরিমাণ নির্ণয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মহাবিস্ফোরণ পরবর্তী প্রথম তিন মিনিটের ঘটনা প্রবাহের রহস্য (এই নিয়ে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েনবার্গের লেখা ফার্স্ট থ্রি মিনিটস বইটির কথা বলা যেতে পারে)। ইতালিয় বিজ্ঞানী কার্লো গুস্তাভিনোর ভাষায় ডিউটেরিয়াম হল "a super-witness of that epoch"। তবে এই রহস্য সমাধান করতে হলে যে হারে ডিউটেরিয়াম একটি প্রোটনের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে হিলিয়াম (He^3) নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা দরকার। ঠিক এই কাজটিই করেছেন LUNA-এর গবেষকরা। এতদিন ডিউটেরিয়ামের প্রোটন শোষন ব্যাপারটির অনিশ্চয়তাই চিন্তার কারণ ছিল বিজ্ঞানীদের। তবে ইলেকট্রনকে সংগ্রহ করে পরমাণুর গড়ে উঠতে সময় লেগেছিল আরও ৩৮০০০০ বছর।

email:acnbu13@gmail.com • M. 8967965340

প্র বী র ব সু

বার্ধক্য প্রতিরোধক প্রচেষ্টা

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে"—এ কথা শুধু কবির কল্পনায় নয়। প্রতিটি মানুষ আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, ভালোবাসা নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে চায়। অনন্ত যৌবনের দূত হয়ে বেঁচে থাকার দুর্মর বাসনা বোধ করি আমাদের সকলের।

মানুষের জীবন দু-রকমের হয় একটি কালনির্ভর বয়স, অপরটি জৈবিক বয়স। কোনো মানুষের কালনির্ভর এবং জৈবিক বয়স এক নাও হতে পারে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষয়ক্ষতি, জিনের পরিবর্তন মেপে কোনোদিন হয়ত জৈবিক বয়স নির্ধারণ করা যাবে। কিন্তু এখনও তা মাপা সম্ভব হয়নি। বয়স বেড়ে মানুষের বার্ধক্য আসে। বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শারীরিক মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা কমে। শারীরিক কিছু প্রাণঘাতী রোগ যেমন ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্মৃতিভ্রংশ, স্ট্রোক, কিডনি, লিভারজনিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বার্ধক্যের শেষ পরিণতি মৃত্যু হলেও বিজ্ঞানীরা বার্ধক্যের শেষ পরিণতি মৃত্যু মানতে চান না। একেক প্রজাতির জৈবিক বয়স বাড়ার হার ভিন্ন। সেজন্যই ইঁদুর ৩ বৎসর অথচ মানুষ ১২২ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। গুরত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জেনেটিক পার্থক্যের জন্য শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি প্রভাবিত হয়। তাই জৈবিক বয়স যাদের ধীরগতিতে বাড়ে, তাদের জীবনও হয় দীর্ঘ।

আজ থেকে দেড়-দুশো বছর আগে বার্ধক্যে মৃত্যুর চেয়ে নানা সংক্রমণে মানুষের বেশি মৃত্যু হত। টিকার আবিষ্কার, রোগ নির্ণয়ে নানা প্রযুক্তির ব্যবহার, অ্যান্টিবায়োটিক, নানা নতুন ঔষধ আবিষ্কার, পুষ্টিকর খাদ্য, নিরাপদ জল ব্যবহারে মানুষের গড় আয়ু এখন হেলায় শতক ছুঁই ছুঁই।

আবার কোনো কোনো গবেষকের ধারণা বার্ধক্য আসার পেছনে প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকাটা জৈব বিবর্তনের প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। একথা ঠিক অনন্তকাল কেউ বেঁচে থাকবে না। কিন্তু অনন্তকাল না হোক বার্ধক্যের আগমনকে মন্থর করে দিয়ে মানুষের গড় আয়ু বাড়ানোর লক্ষ্যে সাম্প্রতিক নানা গবেষণা সংস্থায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থায় গবেষণা চলছে। বর্তমানে পৃথিবীতে এই গবেষণা বিপুল ব্যবসার বাজার খুলে দেবে এই আশায় নানারকম বার্ধক্য প্রতিরোধক গবেষণা চলেছে। মানুষের বার্ধক্য বাড়ে কেন? জরা, বার্ধক্য আসে কেন? বার্ধক্যগ্রস্থ হওয়া বা মৃত্যু কবলিত হওয়া মানবজীবনে অনিবার্য হলেও তা কিভাবে পিছিয়ে দেওয়া যায়?

লক্ষ করা গেছে একমাত্র জিনের সুস্থতাই চেইন সিস্টেমে সব অঙ্গের সক্রিয়তা তথা শারীরবৃত্তীয় কর্মকান্ড নিয়মমাফিক ঘটাতে পারে। দীর্ঘায়িত করতে পারে যৌবনের সীমারেখা। তবে হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চিন্তে বসে নেই বিজ্ঞানীরা। ক্রোমোজোম কাঁটাছেড়া করে প্রয়োজন মত জিন মিউটেশন ঘটানো তাদের কাছে এখন খুব সাধারণ বিষয়। সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন দেখব ক্রোমোজোমের এককোণায় লুকিয়ে থাকা বার্ধক্য ডেকে আনা জিনটিকে টেনে বের করে নতুন কোনো জিন বসিয়ে মানুষকে করে তুলবে বার্ধক্য বিরোধী। রঙিন স্বপ্নে ভরিয়ে তুলবে জীবনের আঙ্গিনা।

এই লক্ষ্যেই ২০১৩ সালে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা 'গুগল' সানফ্রানসিস্কো শহরের অদূরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে Calico নামে একটি সংস্থা স্থাপন করে। এখানে সর্বাধুনিক উচ্চপ্রযুক্তি দিয়ে গবেষণাগার সাজানো হয়েছে। শ'খানেক বিজ্ঞানী যাদের বিজ্ঞানের নানা শাখায় সুনামের রেকর্ড আছে তারা এখানে মানুষের আয়ু বাড়ানোর গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছেন। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য সিনথিয়ান ফেনিয়ন যিনি কুড়ি বছর আগে কেঁচোকৃমির একটি DNA পাল্টিয়ে এদের আয়ু ৩ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ৬ সপ্তাহ করে দেন। ডাফনে কোলার, আর্থার লেভিয়াসান, ডেভিড বোস্টাইন প্রমুখ নামজাদা বিজ্ঞানীরা এখানে অনুসন্ধান করছেন।

আপাতত Calico-তে ইঁদুরের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে খোঁজা হচ্ছে বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়ার জৈবচিহ্ন biomakerগুলো কি? সাধারণ ইঁদুরের আয়ু যেখানে ৩ বৎসর, সেখানে naked mole rat এর আয়ু ৩১ বছর হতে পারে। ক্যালিকোর বিজ্ঞানীরা এই জাতীয় ইঁদুরের বৈশিষ্ট্যগুলো আবিষ্কার করে সেগুলো সাধারণ ইঁদুরে সুকৌশলে ঢুকিয়ে আয়ু বাড়ানোর চেষ্টা করছেন, naked mole rat এর জিন ডিকোড করে এদের দীর্ঘায়ু হওয়ার গোপন রহস্য জানতে তারা বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন। আপাতত লক্ষ্য মানুষের গড় আয়ু অন্তত ১২০ বৎসর হয় তার ব্যবস্থা নেওয়া, ক্যালিকোর বিজ্ঞানী বোস্টাইন আশাবাদী বিজ্ঞানীরা একদিন সুস্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের দীর্ঘায়ু হওয়ার রাস্তা বের করবেনই।

ক্যালিকো বার্ধক্য বিরোধী ঔষধ তৈরি করে বিরাট ব্যবসায়ের আয়োজনেও নেমেছে। ইতিমধ্যে তারা কয়েকটি ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি ও গবেষণাগারের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে। এদের মধ্যে অন্যতম চিকাগোর কাছে প্রতিষ্ঠিত Abbvie নামক ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থা। নিউইয়র্ক-এর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অব মেডিসিনের বার্ধক্য বিশারদরা মনে করছেন বার্ধক্যকে পিছিয়ে দিতে বা মন্থর করতে এখনই নানা ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন। এজন্য তারা ডায়াবেটিস চিকিৎসায় ব্যবহৃত মেটফরমিন ঔষধটি পরীক্ষা করে দেখছেন। কারণ এই ঔষধ ব্যবহারে ডায়াবেটিসে মৃত্যুর সম্ভাবনা শুধু কমছে না, অন্য রোগীদের তুলনায় এদের মৃত্যুর হার ১৫% কমেছে। মেটফরমিন রক্তে শর্করা কমিয়ে দেয় এবং অল্প ক্যালরির খাদ্য তৈরি করে। এই ঔষধটি হৃদরোগ, স্মৃতিভ্রংশতা, ক্যান্সার আটকাতে সাহায্য করে। ২০১৪ সালে ৯০০০০ type-2 ডায়াবেটিক রোগীদের উপর মেটফরমিন ব্যবহারে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে এটি বার্ধক্য প্রতিরোধী।

তবে ঔষধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থারা এখনও বার্ধক্যকে কোনো রোগ ভাবছেন না কাজেই কোন ঔষধ বা থেরাপীকে বার্ধক্য প্রতিরোধক বলে অনুমোদন দিচ্ছেন না। তবে ঔষধ থেরাপী ছাড়া বার্ধক্যকে মন্থর করার নানা পরামর্শ পাওয়া গেছে, যেমন নিম্ন ক্যালরির খাদ্য, নীরোগ শরীর এবং দীর্ঘায়ু হওয়ার জন্য মূলত শাকসবজি খাওয়া এবং নিয়মিত ধ্যান চর্চার কথা বলেছেন।

email: prabirchandrabasu54@gmail.com ● M. 9830676330

BIGYAN ANNESWAK VOL : 18 Issue No. 1 Jan-Feb 2021 RNI : WBBEN/2003/11192 Rs. 15/-
ISSN 2682-5574

কাঁচরাপাড়া পৌরসভা
৪১, নেতাজী সুভাষ পথ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

বাংলায় আজ, প্রতি ঘরে কাজ

নারীর অধিকার, সুরক্ষিত করছে সরকার

কৃষক বাংলার প্রাণ

উন্নয়নের পথ, সর্বত্র বিদ্যুৎ, সড়ক, জল

আমাদের লক্ষ্য, সামাজিক সুরক্ষা

রাজা রাউত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

স্তন্যপায়ী **ভারতীয় প্যাঙ্গোলিন/বনরুই**

সাধারণ ইংরেজি নাম : *Indian Pangolin/Scaly Anteater*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Manis crassicaudata*

সারাদেহে বর্মের মত আঁশ দিয়ে ঢাকা এই স্তন্যপায়ী ব্যতিক্রমি স্তন্যপায়ী। আঁশ সরিসৃপ/মৎস্যের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এরাও বহন করে। কঠিন এই বর্মের জন্য এরা সিংহ/বাঘ প্রভৃতি বড় বড় খাদকপ্রাণী থেকেও বেঁচে যায়। এরা মূলতঃ পিঁপিলিকাভুক। এই প্রাণীটি মূলতঃ নিশাচর। একদা সারা ভারতে পাওয়া গেলেও আজ দুর্লভ হয়ে পরেছে। মানুষের অন্ধ বিশ্বাস ও বর্মের জন্য এদের শিকার করা হয়—যদিও বন্যপ্রাণী আইনে এটা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

পাখি

বুনো পেঁচা

সাধারণ ইংরেজি নাম :
Forest Owlet

বিজ্ঞানসম্মত নাম :
Athene blewitti

মূলতঃ মধ্য ভারতের জঙ্গলের বাসিন্দা বিপন্নতার কারণে ২০১৮ সালে IUCN-এর লাল তালিকায় 'বিপন্ন (Endangered)'-রূপে নিজের নাম লিখিয়েছে। মনে করা হচ্ছে সারা দেশে আনুমানিক ১০০০-এর নিচে পূর্ণপ্রাণী বেঁচে রয়েছে এই মুহূর্তে। ১৮৭৩ সালে প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং ১৮৮৪ সালের বহু বছর দেখা যায়নি। ১৯৯৭ সালে বিজ্ঞানী পামেলা রাসমুসেন পুনরায় আবিষ্কৃত করেন। বর্তমানে অনুমান করা হচ্ছে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, উড়িষ্যা প্রভৃতিতে দেখা যেতে পারে।

মাছ **গুঞ্জ/দৈত্যাকার মাগুর**

সাধারণ ইংরেজি নাম : *Goonch/Giant Devil Catfish*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Bangarius yarrelli*

বাঘাআড়ির পরিবারের অন্যতম বড় দৈত্যাকার এই দুর্লভ মাছ গড়ে ১০০ কে.জি. পর্যন্ত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের এই প্রজাতিটি উত্তরাখণ্ডের কালি নদীতে ১৯৯৮-২০০৭ সালের মধ্যে বেশ কিছু স্থানীয় গ্রামবাসীদের আক্রমণ করে খেয়ে ফেলে। আতঙ্কের পরিবেশে পরবর্তীতে বিখ্যাত মৎস্যবিজ্ঞানী জেরেমি বাদে এই ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটে বেশ রোমাঞ্চকর ও জনকপ্রিয় ভিডিও, ফিল্ম তৈরি করেন। মানুষের শিকারের কারণে এদের বর্তমান অবস্থা খুব সংকটজনক।

অমেরুদণ্ডী **রামেশ্বরম রঙ্গিন ট্যারান্টুলা**

সাধারণ ইংরেজি নাম : *Rameswaram Ornamental Spider*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Poecilotheria hanumavilasumica*

খুব প্রাচীন এবং অত্যন্ত দুর্লভ এই বড় মাকড়সা ২০০৪ সালে বিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু স্মীথ ভারতের রামেশ্বরম-এর হনুমাভিলাসুম মন্দিরের পবিত্র গুহা থেকে আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে শ্রীলঙ্কার উত্তরের জেলা 'মানার'—যা তামিলনাড়ু সংলগ্ন থেকে পাওয়া যায়। মনে করা হয় প্লিস্টোসিন যুগে মূখ ভূ-খণ্ড ভারত থেকেই ওখানে বিস্তার লাভ করে এই প্রজাতি।

IUCN-এর লাল তালিকায় এরা তীব্রভাবে সংকটাপন্ন প্রজাতি (Critically Endangered) রূপে চিহ্নিত হয়েছে এই জীবটি।

email: rajarouthbhbl@gmail.com • M. 9474417178